দুই

সন্তোষ ঢালী

ছাই

সন্তোষ ঢালী

গ্রন্থ কুটির

সন্তোষ ঢালী
মা: শ্রীমতীদেবী ঢালী
বাবা: নিত্যানন্দ ঢালী
জন্ম: পয়লা বসন্ত ১৩৭০, ১৩ ফেব্রুয়ারি ১৯৬৪।
জন্মস্থান: পুকুরিয়া, কদমবাড়ি, রাজৈর, মাদারীপুর।
শিক্ষা: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাংলা সাহিত্যে
বি.এ. (অনার্স), এম.এ, বি.এড, এম.ফিল, পিএইচ.ডি।
সংগীত: বুলবুল ললিতকলা একাডেমি থেকে
উচ্চাঙ্গ সংগীতে সার্টিফিকেট কোর্স উত্তীর্ণ।
শখ: গিটার বাজানো, গান করা, আবৃত্তি করা।
তালিকাভুক্ত শিল্পী: বাংলাদেশ বেতার, ঢাকা ও
বাংলাদেশ টেলিভিশন, ঢাকা।
তালিকাভুক্ত গীতিকার: বাংলাদেশ বেতার, ঢাকা।
পেশা: অধ্যাপনা। বি.সি.এস. (শিক্ষা)।
কর্মস্থল: অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ;
সরকারি বেগম রোকেয়া কলেজ, রংপুর।
পুরস্কার: একুশের সাহিত্য পুরস্কার, মুক্তধারা ১৯৯০,
সুনীল সাহিত্য পুরস্কার, মাদারীপুর ২০০৯,
অনুভব সম্মাননা, ঢাকা ২০১৩,
বিন্দু বিসর্গ সম্মাননা, গাইবান্ধা ২০১৬।
সম্পাদনা: নৈবেদ্য, ফুলকি, কালরাত।
প্রকাশিত বই:
কবিতা: ফসিল, প্রপার জন্য পঙ্‌ক্তিমালা,
একলব্যের তীর, ভুবনডাঙা, আকাল।
গল্প: অন্তরঙ্গ দ্বৈরথে, নিলামবালা, ছাই, দর্পণ, ৭১।
উপন্যাস: মন না মতি, অচেনা মানুষ।
পাঠ্য: ব্যাবহারিক বাংলা (ব্যাকরণ)।
অভিপ্রায়: ফিরে চল মাটির টানে।

ছাই সম্পর্কে

ছাই সন্তোষ ঢালীর তৃতীয় গল্পগ্রন্থ।

পূর্বপ্রকাশিত গ্রন্থদু'টোতে তিনি তাঁর স্বাতন্ত্র্যের স্বাক্ষর রেখেছেন। তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি, জীবনবোধ, ভাষাশৈলী ইতোমধ্যে পাঠকের মনোযোগ কেড়েছে। বাংলাদেশের গল্পভুবনে সন্তোষ ঢালী একটি সুপরিচিত নাম। ১৩ টি গল্প স্থান পেয়েছে এ গ্রন্থে। সবক'টি গল্পই রম্যগল্প। সমকালীন সমস্যা সঙ্কট স্বার্থ গোঁড়ামি অন্ধত্ব ইত্যাদি এ সব গল্পের উৎসভূমি। চারপাশের চেনা-অচেনা, জানা-অজানা নানা বিষয় গল্পের প্রতিপাদ্য।

গল্পের চরিত্রগুলো বেশির ভাগই সাধারণ মানুষ। গ্রামের মানুষ। চাহিদা অল্প। অল্পেই তুষ্ট। আদারি এক প্যাকেট স্টার সিগারেট পেলেই খুশি। বাসে চেপে শ্বশুরবাড়ি যাবার মধ্যেই পরেশের গর্ব। খেলার ফিচার লেখে বলে কেউ সাংবাদিকের মর্যাদা দেয় না বলে জাকিরের কষ্ট। মাত্র দু'কেজি চালের জন্য বিশ্বনাথের হোটেল বন্ধ। এইসব মামুলি বিষয় রঙিন রেখার আঁচড়ে হয়ে উঠেছে অসাধারণ, শিল্পসম্মত। ভণ্ডামি-শঠতা-সারল্য, পাওয়া-না পাওয়ার কষ্ট, ঈর্ষা-ক্ষোভ-লোভ এসব মুক্তোদানার মতো ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে ছাই এ। ব্যঙ্গ কৌতুকের মাধ্যমে গল্পকার পাঠকের কাছে তুলে ধরতে চেয়েছেন সমকালীন জীবন-বাস্তবতা।

যে কোনো কারণেই হোক বাঙালি হাসতে ভুলে গেছে। রঙ্গ বা কৌতুকপ্রিয় বাঙালি আজ হতাশায় নিমজ্জিত। জীবন থেকে হাসি তাই নির্বাসিত। শত দুঃখ-কষ্টের মধ্যেও বাঙালির সেই হাসিকে ফিরিয়ে আনার প্রচেষ্টা সন্তোষ ঢালীর। তারই বহিঃপ্রকাশ **ছাই**। নিছক হাসি নয়, রঙিন চশমার অন্তরালে রয়েছে ধূসর গভীর ক্ষত। **ছাই** এর গাদায় পাঠক যদি আগুন খুঁজে পান তবেই লেখকের সার্থকতা। প্রত্যাশা **ছাই** থেকে জন্ম নেবে নতুন ফিনিক্স। আমার বিশ্বাস গ্রন্থটি পাঠকপ্রিয়তা পাবে।

– প্রকাশক

ছাই
সন্তোষ ঢালী

প্রকাশকাল	:	বইমেলা, ২০১৬
প্রকাশক	:	রতন চন্দ্র পাল গ্রন্থ কুটির ২৬, বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০।
গ্রন্থস্বত্ব	:	সংহিতা ঢালী খেয়া
প্রচ্ছদ	:	ধ্রুব এষ
বর্ণবিন্যাস	:	সুপ্তি কম্পিউটার সিস্টেম এন্ড গ্রাফিক্স
মুদ্রণ	:	দিকদর্শন প্রেস এন্ড পাবলিকেশন্স, ঢাকা।
পরিবেশক	:	দিকদর্শন প্রকাশনী লি. ২৬ বাংলাবাজার, আলীরেজা মার্কেট (২য় তলা), ঢাকা ১১০০ ফোন : ৭১১৫৬১৮, ০১৭১২-১১৯৩১৮।
মূল্য	:	২০০.০০ টাকা মাত্র।

ISBN: 978-984-92159-0-5

সূচি

বিশ্বনাথের হোটেল	০৮
পরেশের শ্বশুরবাড়ি গমন	১৩
ইদ্রিসের কবর	১৭
ছাই	২১
আদারি	৩১
মহুয়ার জন্যে অপেক্ষা	৩৬
কেমন আছেন আপা	৩৯
আপন ঘরে পরবাসী	৪৫
বাদশার মা	৪৯
শেফালি	৫৩
যোগেশের মৃত্যুবিভ্রাট	৫৭
শ্রী শ্রী দুর্গাদাস পণ্ডিতের দেহত্যাগ	৬২
সুইসাইড	৭৪

অগ্নিলা মণ্ডল
নিকিভা মণ্ডল

যাদের মুখে সুধা ঝরায়
‘বড়মামা ডাক’
বুকের ভেতর তারা দু’জন
জনম ভরে থাক

বিশ্বনাথের হোটেল

শৈলেনের ঘড়িটা চুরি গেছে গতকাল। সিকো ফাইভ। অটোমেটিক ঘড়ি। সতের জুয়েল। দিন-তারিখ ওঠে। ষোলশো টাকা দাম। ওই দামে একটা দুধেল গাই কেনা যায়। হোস্টেলে আর কারও সিকো ফাইভ ঘড়ি নেই। হোস্টেলে কেন, গোটা স্কুলেই নেই। ওটা একটা আভিজাত্যের প্রতীক। খুব শখের। ক্লাস এইটে বৃত্তি পাবার পর তার দাদা ওটা গিফট করেছিল তাকে। তাই ঘড়িটার একটা আলাদা তাৎপর্য আছে। কদর আছে ওর কাছে। সেটা খোয়া গেল সন্ধের সময় যাত্রার আসরে। ফিরে তো আর পাওয়া যাবে না, কী আর করা? সকালবেলা পুরোহিত ডেকে খালের ঘাটে মন্ত্র পাঠ করে দান করে দিল। চোরকে ঘড়ি দান। সবাই বলল 'উড়ো খই গোবিন্দায় নমো'। স্নানঘাটে মাটির পিদিম। আগরবাতির ধোঁয়া। কলার পাতায় তিল তুলসী ধান দুর্বা বিল্বপত্র। ঠোঙায় বাতাসা। পুরোহিত বৃদ্ধ বিশ্বনাথ ভট্টাচার্য ফোকলা দাঁতে ভুলভাল মন্ত্র পড়ে দানকার্য সমাধা করল। এ সময় হঠাৎ তীব্র পচা দুর্গন্ধে সবাই সচকিত। তাকিয়ে দেখা গেল মধ্য খালেএকটা মরা আধ-পচা গরু ভেসে যাচ্ছে ধাপের মতো। তার উপর একটা নেড়ি কুত্তা দাঁড়িয়ে। খাচ্ছে। খাবারের উপর দাঁড়িয়ে খাবার খাচ্ছে আর ভেসে চলছে কালস্রোতে মহাকালের পথে। সে হঠাৎ খাওয়া থামিয়ে বিস্ময় বিহ্বল হয়ে ব্রাহ্মণের দিকে তাকিয়ে রইল। যেন আজব এক কাণ্ড দেখছে। ঊর্ধ্বাঙ্গে উপবীত। খালি গা। পরনে মোটা খাটো মলিন ধুতি। টাক মাথার পেছনে লম্বা টিকি। দানকার্য সমাধা হলে ব্রাহ্মণকে একটা নতুন গামছা, দু'সের চাল আর একশো পঁচিশ টাকা দক্ষিণা দেয়া হলো। ব্রাহ্মণ মহাখুশি। পরিতৃপ্ত।

শশিকর বাজারেরই এক পাশে ছোট্ট একচালা একটা খড়ের ঘরে থাকে বিশ্বনাথ কবিরাজ। মানুষের অভাব নেই এ বিশ্বে, কিন্তু বিশ্বনাথের সংসারে সব মিলিয়ে মানুষ মাত্র একজন। সব মিলিয়ে মানে আরও প্রাণী রয়েছে কয়েকটা। একটা কুকুর, দু'টো বিড়াল, একটা ছাগল, কয়েকটা ইঁদুর আর বিশ্বনাথ। এর মধ্যে মানুষ মাত্র একা বিশ্বনাথ। বিয়ে করে নি বলে সংসারের বৃদ্ধি ঘটে নি। সন্ধের পরে তাই গৃহযুদ্ধ লাগে না। থালা-বাসনের ঝনঝনানি শোনা যায় না। কাংসনিন্দিত কণ্ঠের ধ্বনি ওঠে না। শ্মশানের নৈঃশব্দ। বাজারের উপর বাসস্থান বলে চলে যায় এভাবে সেভাবে কোনোভাবে একরকম। এর কাছে একটা কলা, ওর কাছে একটা মূলা, তার কাছে একটা আলু নিয়ে নেয় চেয়ে-চিন্তে। বাধা দেয় না কেউ। সবাই দেয় স্বেচ্ছায়। নিজ হাতেই রান্না করে খায়। নাম বিশ্বনাথ কবিরাজ। কবিরাজি জানুক না জানুক কবিরাজি করে। বাজারের মধ্যে গাছ গাছড়া লতা পাতা যোগাড় করে চাটাই পেতে বসে পড়ে। হাটবারে আর না হলেও দু'চার টাকা রোজগার হয়। হাতও দেখে। পবনবাবু হাইস্কুলের গণিতের শিক্ষক হাত গণনা করার জন্যে কিনে দিয়েছেন বড় একটা আতশীকাচ। তাই দিয়ে জ্যোতিষবিদ্যার চর্চা করে। আর ব্রাহ্মণ বলে পুজো-পার্বণে পৌরহিত্য করে থাকে। অবশ্য একবার যে বিশ্বনাথ কবিরাজের কাছে যায় সে আর দ্বিতীয়বার ওমুখো হয় না। এমনই হাতযশ তার। বুড়ো মানুষ বলে মারধর খায় না। লোকে বলে– মাথায় ছিট আছে লোকটার। কথা বলার সময় থুতু ছিঁটে বেরয় বলে তার কাছে সবাই মুখের সামনে হাত দিয়ে রাখে। সে ভাবে, তাকে অনার করে।

দু'সের চাল আর একশো পঁচিশ টাকা পেয়ে বিশ্বনাথ বেজায় খুশি। লটারি প্রাপ্তির সুখ। এক সাথে এত চাল বা এত টাকা কখনও হাতে আসে নি তার। কার মুখ দেখে যে ঘুম ভেঙেছিল আজ সকালে। কী করা যায়? চিন্তায় ঘুম নেই। স্বপ্নে তার কূললক্ষ্মী কয়ে দিল 'যা বাছা, হোটেল খোল। বড়লোক হয়ে যাবি কালে'। একটা হোটেল খোলার পরিকল্পনা করল। রান্নার হাত বড় ভালো তার। একবার যে তার রান্না খেয়েছে, সে আর ভুলবে না তার স্বাদ। এটাই ভরসার। দু'সের চালে অন্তত দশ জন লোকের খাওয়া হয়ে যাবে। আর একশো পঁচিশ টাকায় তেল নুন হলুদ মরিচ মাছ তরকারি ধনেপাতা ডাল।

শশিকর বাজারের পাশেই হাইস্কুল এবং স্কুলের পাশেই হোস্টেল। হোস্টেলের মধ্যে ভালো হাতের লেখা রথীনের। রঙিন কালিতে বড় বড় করে তাকে দিয়ে লিখিয়ে নিল 'বিশ্বনাথের হোটেল'। ঘরের সামনে লাগিয়ে দিল আঠা দিয়ে। হাড়ি-পাতিলের দোকানদার নুরু মিয়ার বাড়ি ডামুড্যা। দু'একবার বাড়ি যায় বছরে। নতুন বিয়ে করেছে। বউয়ের সাথে যোগাযোগ করা দরকার। কিন্তু লেখাপড়া জানে না। তাই রথীনকে দিয়ে লিখিয়ে নেয় চিঠি। প্রাণের বাসনা, যাবতীয় গোপন কথা, যা কিছু রসের কথা বলে যায় রথীনকে; আর রথীন তাই লিপিবদ্ধ করে অবলীলায়। সেই নুরু মিয়ার দোকান থেকে একটা বড় পাতিল, দু'টো থালা আর দু'টো অ্যালুমিনিয়ামের গেলাস ধারে কিনল বিশ্বনাথ তার হোটেলের জন্য। আর একটা থালা এবং একটা গেলাসতো তার নিজেরই আছে। এক সাথেতো আর দশ জন খেতে বসবে না? তিন জন করে খেতে পারবে এক সাথে।

প্রতি মিলে রান্না হয় দু'সের চাল। পরিমাণমতো ভাজি সব্জি ডাল। আর দশটা মাছের ঝোল। হয় দশটা কই মাছ, নয় দশটা সরপুঁটি মাছ, নয়ত দশটা রয়না মাছ রান্না হয়। মাথাপিছু দশ টাকা প্রতি মিল। ভাত যে যত পারে। ফ্রি। আর একটু ভাজি, এক বাটি ডাল, একটু সব্জি। আর মাছের ঝোল এক পিস্– সাকুল্যে দশ টাকা। দশ জনের বেশি রান্না হয় না বিশ্বনাথের হোটেলে। পুঁজি ওটুকুই। 'আগে আসিলে আগে খাবেন' ভিত্তিতে খাবার পরিবেশন। যারা খেতে আসে সবাই পরিতৃপ্তির ঢেঁকুর তুলে নতুন গামছায় হাত মুছে এক টুকরো পচা সুপারি মুখের ভেতর ছুঁড়ে দিয়ে চলে যায় যে যার রাতের আস্তানায়। ভাতে কম পড়ে নি কখনও। বরং মাঝে মধ্যেই পান্তা থেকে যায়। সকালের খাবারটা তার হয়ে যায়। এভাবেই চলছিল বেশ। কয়েক মাস পরে একদিন হঠাৎ বিনা মেঘে বজ্রপাত। ব্যাটা সুরঞ্জন দিল ক্যাচাল লাগিয়ে। হোটেল বন্ধ।

কে এই সুরঞ্জন? ভাঙারহাটের সুরঞ্জন বেটেপানা। কানে খাটো। উল্টাপাল্টা শোনে, উল্টাপাল্টা বলে, উল্টাপাল্টা জবাব দেয়। যেমন কেউ জিজ্ঞেস করল– সুরঞ্জন, কোথায় গেছিলা, বাজারে? সুরঞ্জন বলল– না, একটু বাজারে গেছিলাম। পেটমোটা। খাওয়ার সময় হুঁশ থাকে না। ভাত খায় এক গামলা। এ নিয়ে হোস্টেলের সবাই হাসাহাসি করে বলে সবার শেষে খেতে যায় সে ডাইনিং-এ। একা একা খায়। মাথামোটাও। অঙ্কে পায় শূন্য। বিজ্ঞানে দশ বারো। তার ধারণা, ক্লাস নাইনের ফার্স্ট বয় হতে পারত সে প্রত্যেক বিষয়ে মাত্র ষাট সত্তর নম্বর করে বেশি পেলে। তা ভাগ্যে নেই। ভাগ্য খোলার জন্য বিশ্বনাথ কবিরাজকেও দুই টাকা দিয়েছে একদিন হাত দেখিয়ে। আর তিন টাকা দিয়ে হাতে নিয়েছে একটা পাথরের আংটি। বিশ্বনাথ বলেছে এবার সে ফার্স্ট হবেই, রেখায় দেখা যায়। ভবিষ্যতে নাকি মন্ত্রী হবার সম্ভাবনাও আছে। সে আনন্দেই ঘুম কামাই। রেজাল্ট বেরুলে দেখা গেল বোর্ডে তার নামই নেই। প্রোমোশন জোটে নি। মনকে প্রবোধ দেয়, খাতা ঠিকমতো দেখে নি স্যাররা। বাস্তবতা মেনে নিতে কষ্ট হয় সুরঞ্জনের। দুঃখ, তার মেধার দাম দিল না শিক্ষকরা।

স্কুল দু'দিন ছুটি ছিল বলে সুরঞ্জন গেছিল বাড়ি। ফিরতে সন্ধে হলো। ততক্ষণে রাতের রান্না শেষ হোস্টেলের। অগত্যা বিশ্বনাথের হোটেল। আগে কখনও সে খায় নি এ হোটেলে। আজই প্রথম। অবশ্য আজই শেষ। সবে রান্না শেষ হয়েছে বিশ্বনাথের। গরম গরম সাজিয়ে রাখা। চিচিংগা ভাজি, কুমড়োর তরকারি, ডাল আর দশটা কই মাছের ঝোল। ভাত ফ্রি। যে যত পারে। প্লেট ধুয়ে আয়েস করে বসে পড়ে সুরঞ্জন। চিচিংগা ভাজি, কুমড়োর তরকারি শেষ। এরপর একটা কই মাছ নিল পাতে। এরই মধ্যে গামলার অর্ধেক খালি। গামলার দিকে চোখ যেতে বিশ্বনাথের বিশ্ব টালমাটাল। মাছ দিয়ে খাওয়া শেষ করতে শেষ হলো আরও কিছু ভাত। বাকি ভাত ডাল দিয়ে লেবু কাঁচা মরিচ দিয়ে কাবার। দু'সের চালের ভাত শেষ। সুরঞ্জনের খাওয়া যখন শেষ, গামলায় তখন আর কোনো ভাত অবশিষ্ট নেই। বিড়ালটার জন্যও না। ভাত যেহেতু ফ্রি বিশ্বনাথের বলার কিছু

নেই। তখনও ডাল, ভাজি, তরকারি আর নয়টা কই মাছ রয়েছে অবশিষ্ট। বিশ্বনাথের বুড়ো হাড়ে কাঁপুনি ধরে। কই মাছের ঝোলের দিকে তাকিয়ে চোখে জল আসে। কই মাছগুলো জ্যান্ত থাকলে ছেড়ে দিয়ে আসত খালের জলে। চোখের সামনে দু'সের চালের ভাত হাওয়া। একবার সুরঞ্জন আর একবার শূন্য গামলায় দৃষ্টি চালায় বিশ্বনাথ।

সে এখন কী করে? নালিশ জানায় কাকে? হোটেলে ভাত না থাকায় খদ্দের গেল ফিরে। সব্জি ডাল আর শুধু মাছ খেতে তো হোটেলে আসে না কেউ। তার চালান শেষ। সেই থেকে বিশ্বনাথের হোটেল বন্ধ। চিনের দুঃখ যেমন হোয়াংহো, বিশ্বনাথের দুঃখ সুরঞ্জন।

বিশ্বনাথের মাথা গরম। টাক মাথায় ঠাটার বাড়ি। দুঃখ সহনও না যায়, কহনও না যায়। চলে যায় খালের ঘাটে। নেমে পড়ে জলের ভিতর। সন্ধেরাতে ডুবুতে থাকে হাপুস হুপুস। ওঠে না। যখন হাঁচি শুরু হয় তখন উঠে পড়ে। মাথাটা ততক্ষণে কিছুটা ঠাণ্ডা। কিন্তু মন থেকে কোনোভাবেই তাড়াতে পারে না সুরঞ্জনের ভূত। রাতে আর খেতে ইচ্ছে হলো না। না খেয়েই শুয়ে পড়ল। রাতভর সুরঞ্জনের মুখটা মনে পড়তে লাগল। তার দোষটাও ঠিকমতো শনাক্ত করতে পারছে না। তার প্রতি রাগ, আবার রাগও না। ভাত ফ্রি। বাটি মেপেতো ভাত দেয়ার ব্যবস্থা ছিল না। তাহলে সুরঞ্জনের দোষ কোথায়? তবুও 'বিশ্বনাথের হোটেল' বন্ধ হবার জন্য সুরঞ্জনই দায়ী। ক্ষমা মহত্ত্বের লক্ষণ হলেও সে ক্ষমা করতে পারছে না সুরঞ্জনকে।

রাতে আবার স্বপ্ন। ব্যবসার দেবতা গণেশ এসেছে তার হোটেলে খেতে। চাটাই পেতে বসতে দিয়েছে তাড়াতাড়ি। থালা দিয়েছে। গেলাস দিয়েছে। কই মাছ দিয়েছে। কিন্তু গামলায় কোনো ভাত নেই। গামলা খালি। তার মধ্যে একটা বিড়াল গড়াগড়ি যায়। গণেশতো রাগে টঙ। পার্বতীপুত্র গণেশের সাথে তামাশা! খাবার না পেয়ে মাইন্ড করেছে। বলছে হোটেল চালু রাখতে। এবারে সাফল্য নিশ্চিত। কিন্তু গণেশের মুখটা কেমন করে যেন সুরঞ্জনের মুখ হয়ে যায়। বিশ্বনাথের স্বপ্নটা বিস্বাদ হয়ে গেল। সিদ্ধান্ত নেয় এবারে আর ভাত ফ্রি দেবে না, বাটি মেপে দেবে। আবার ভাবে, তাহলে হোটেলের ঐতিহ্য নষ্ট হবে। তার চেয়ে সুরঞ্জনকে আর খেতে দেবে না তার হোটেলে। তাই ভালো। নিচে লাল অক্ষরে লিখে দেবে– 'সুরঞ্জনের প্রবেশ নিষেধ'। সুরঞ্জন, অইখানে যেয়ো নাকো তুমি/ বোলো নাকো কথা অই বিশ্বনাথের সাথে/ ফিরে এসো সুরঞ্জন/ মিষ্টিপানের গন্ধ ভরা হাটে।

শশিকর বাজার থেকে কোনো পত্রিকা প্রকাশিত হয় না, তবু সকাল হলে খবরটা রটে যায়– সুরঞ্জনের কারণে বিশ্বনাথের হোটেল বন্ধ। হোস্টেল সুপার তাকে ডেকে জিজ্ঞেস করলে সুরঞ্জন খবরের সত্যতা নিশ্চিত করল। বিষয়টি সবার চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। বাজারের একমাত্র হোটেল এখন হুমকির মুখে। সুরঞ্জনের কারণে বন্ধ হতে চলেছে। এটা একটা আঞ্চলিক সমস্যা। অঞ্চলের স্বার্থে যে কোনো মূল্যে ঐতিহ্যবাহী এ হোটেলকে বাঁচাতে হবে। গঠন করা হলো সর্বদলীয় ঐক্য পরিষদ। তারা সবার কাছ থেকে চাঁদা তুলে যৌথ ফান্ড গঠন করল এবং এক ঘরোয়া অনুষ্ঠানের মাধ্যমে বিশ্বনাথের হাতে তুলে দিল বাজার কমিটির সভাপতি। সুরঞ্জনের প্রশ্ন– তার প্রবেশ নিষিদ্ধ হবে কেন? সে কি মানুষ না? সে কি ছাগল যে বেড়া ভেঙে বাগান খাবে? এটা অমানবিক। তার আবেদন যৌক্তিক। এরপর নির্ধারণ করা হয়, সুরঞ্জন ওখানে খেলে তাকে দিতে হবে ডবল চার্জ। সুরঞ্জন একজন হয়েও দু'জন হয়ে গেল। তবু দুশ্চিন্তা কাটে না বিশ্বনাথের। কী এক আশঙ্কায় বুক দুরুদুরু করে। সুরঞ্জনকে দেখলে দূর দিয়ে হাঁটে। আড়চোখে তাকায়। যমদূত মনে হয়। সুরঞ্জন টের পায় ব্যাপারটা। কিন্তু তার কী করণীয় তা সে বোঝে না।

এক সন্ধ্যায় যখন রান্না প্রায় শেষ সুরঞ্জন এসে হাজির। তাকে দেখে বিশ্বনাথের পিলে চমকে ওঠে। বিশ্বনাথ কাকুতি জানায়– তুমি চইল্যা যাও সুরঞ্জন। আবার বন্ধ করে দিও না আমার হোটেল।

সুরঞ্জন– আমি খাইতে আসি নাই। তোমার হোটেলের ম্যানেজারি করতে আইছি।

– আমার ম্যানেজার লাগবে না। তুমি বিদায় হও।

প্রেম-প্রত্যাখ্যাত নায়কের মতো বেদনাহত হৃদয়ে বিদায় নেয় সুরঞ্জন। পেছন ফিরে একবার তাকায়ও না। বিশ্বনাথ হাঁফ ছেড়ে বাঁচে। কিন্তু ছায়ার মতো শঙ্কা তার পিছু পিছু ধায়। লেপ্টে থাকে আষ্টেপৃষ্ঠে। জপের মালার কৃষ্ণ নামের মতো সারাক্ষণ সুরঞ্জনের নামটা মাথায় ভাসে বিশ্বনাথের। বিড়বিড় করে।

শত্রু-মিত্র দুইই আছে সুরঞ্জনের। শত্রুপক্ষ বলল, হোটেলে খেলে যদি ডবল দাম দিতে হয়, তাহলে হোস্টেলেও ডবল মিল ধরতে হবে। এখানেওতো ভাত দ্বিগুণ খায়। মিত্রপক্ষ বলল, মানুষ যেহেতু সে একজন, হোটেল বা হোস্টেল দু'জায়গাতেই তাকে এক মিলের হিসেব ধরতে হবে। শুরু হয়ে গেল আন্দোলন। সুরঞ্জনের অন্য এক সুনাম আছে সমাজে। শশিকর অঞ্চলে নানা প্রতিযোগিতা হয়। যেমন তাস খেলা, দাবা খেলা, জুয়া খেলা, ফুটবল খেলা, ভলিবল খেলা, হাডুডু খেলা, ক্রিকেট খেলা, ব্যাডমিন্টন খেলা, সাঁতার কাটা, ক্রীড়া প্রতিযোগিতা ইত্যাদি। একবার অভিনব একটা প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। ঘুমের প্রতিযোগিতা। কে কত ঘুমাতে পারে, তার প্রতিযোগিতা। প্রতিযোগিতাটা এমন যে ঘুম থেকে জাগা যাবে না। ঘুম থাকুক বা ভাঙুক চোখ খোলা যাবে না। চোখ বন্ধ। স্নান, খাওয়া, পায়খানা, পেচ্ছাব সব ঘুমন্ত অবস্থায়। মানে চোখ বন্ধ থাকতেই হবে। চোখ খুললেই আউট। সে ক্ষেত্রে প্রত্যেকের সাথে সব সময় একজন করে সাহায্যকারী থাকবে। সে সব কিছু তদারকি করবে। আর নানা ধরনের ভলান্টিয়ার নিযুক্ত করা হয়েছে। রয়েছে পর্যবেক্ষক। তারা খেয়াল করবে কেউ চোখ খোলে কি না। এছাড়াও দর্শক তো রয়েইছে শতশত সারাক্ষণ।

ঘুমকাতুরে মিজান ছিল তোৎলা। উচ্চারণে বেশ জটিলতা ছিল। হোস্টেলের সিনিয়র নজরুল ভাইকে কোনোদিন সে ঠিকভাবে ডাকতে পারে নি। কতক্ষণ ন ন ন করে তারপর বলত 'নরজুল' ভাই। কোনোদিন 'নজরুল' ভাই বলতে পারে নি। হেডমাস্টার 'দীপকেন্দ্র' স্যারকে সে বলত 'দীপ কেন্দ্র' স্যার। ব্যাডমিন্টনকে বলত ব্যাড মিল্টন। মিজান ক্লাসেও সারাক্ষণ ঘুমুত। ঘুমুলে নাকও ডাকত। তাই সবার পেছনে বসত। ইতিহাসের দিলদার স্যার একদিন পড়াচ্ছিলেন আলেকজান্ডারের দিগ্বিজয়ের কাহিনি। পুরো ক্লাসটা মিজান ঘুমিয়েই কাটাল। ঘণ্টা বাজলে ঘুম ভাঙল। স্যার জিজ্ঞেস করলেন– বল তো মিজান, আলেকজান্ডার কীভাবে দিগ্বিজয়ে বাহির হইলেন? মিজান উত্তর দিল– স্যার, এইভাবেই আলেকজান্ডার দিগ্বিজয়ে বাহির হইলেন। দিলদার স্যারের দিলটা খুলে গেল। সামনে ডাকলেন। বললেন– এত পারিস কী করে? মিজান বলল– স্যার, এমনিই, বলি আর হয়ে যায়। আর যায় কোথায়, স্যার বললেন– মিজান, তোরে লাগে খালে ভিজান। বলেই দমাদ্দম পিটানি। সেই মিজানেরই ঘুমে ফার্স্ট হবার কথা। কিন্তু হয়ে গেল সেকেন্ড। কী কুক্ষণে যে চোখ মেলে ফেলল! টানা ছাব্বিশ দিন ঘুমুনোর পর কেমন করে যেন হঠাৎ চোখটা ঈষৎ ফাঁক হয়ে গেল। এতদিনের পুরনো চোখটা বিট্রে করে বসল। কাউকে বিশ্বাস করার জো নেই। নিজের চোখকেও না। প্রবাদটা সত্যি হয়ে গেল তার বেলায়। ফার্স্ট হওয়া হলো না মিজানের।

বিশ্ব রেকর্ড গড়ার চিন্তায় সুরঞ্জন চোখ খোলে নি। আরও চারদিন বেশি ঘুমিয়ে ত্রিশ দিন অর্থাৎ এক মাস পূর্ণ করল। সুরঞ্জন ফার্স্ট হলো ঘুমে। ঘুম ভাঙল, কিন্তু চোখ খোলে না। চোখ মেলতে পারে না। আলো সহ্য হয় না। অন্ধকারই যেন ভালো ছিল। নব জাতকের মতো পিটপিট করে তাকায়। সুরঞ্জন যেন মাতৃগর্ভ থেকে এইমাত্র ভূমিষ্ঠ হলো। প্রথম পুরস্কার লেপ তোশক কাঁথা বালিশ বেডসিট মশারি তোয়ালে আর একটা বদনা।

বদনা কী কারণে তা জানা যায় নি। 'অলম্বুস' খেতাবে ভূষিত করা হলো সুরঞ্জনকে। সার্টিফিকেট দেয়া হলো। ক্রেস্ট দেয়া হলো। অঞ্চলের সবচেয়ে অলস ব্যক্তিকে করা হলো প্রধান অতিথি। তাকে মাথায় করে সবার সে কী নৃত্য! সেই থেকে এলাকায় সে লিজেন্ড। সুরঞ্জন হেঁটে গেলেও সবাই আঙুল উঁচিয়ে দেখায়– ওই যে সুরঞ্জন যায়। গোটা অঞ্চলে তার আলাদা একটা কদর আছে। আঞ্চলিক ব্যক্তিত্ব। তাকে নিয়ে মশকরা চলে না। তা অঞ্চলের জন্য কলঙ্কের। সে এখন সবার গর্ব। তাই নানা আলোচনা সমালোচনা সভা সমাবেশ তর্ক বিতর্ক শেষে সর্বসম্মতিক্রমে এই সিদ্ধান্ত নেয়া হয় যে সুরঞ্জন মানুষ একজন, তাই তার হোটেল কিংবা হোস্টেল সর্বত্রই মিলচার্জও একজন পরিমাণের। অর্থাৎ অন্যের সমান। মানি লোকের মান নিয়ে আর ছিনিমিনি খেলা নয়। কেউ কেউ অবশ্য মুখ টিপে হাসল। বাঁকা চোখে তাকাল। সমাজে নিন্দুকের তো অভাব নেই! –রবীন্দ্রনাথ বলে গেছেন একথা অনেক আগেই।

দাবানলের আগুন পৌঁছাতে দেরি হতে পারে, খবরটা বিশ্বনাথের কানে যেতে দেরি লাগে নি। বিশ্বনাথের জগত যেন মেঘে ঢাকা তারা। আবার বিপদাপন্ন হয়ে গেল, বিস্বাদ হয়ে গেল। জীবনটা যেন নিমের পাচন। বিষম তেতো। হোটেল নিয়ে আবার সে ভাবনায় পড়ল। নিজের চুল ছিঁড়তে ইচ্ছে হচ্ছে। কিন্তু তার মাথা যে টাক, কোন চুল নেই। পেছনে শুধু একটা টিকি। ছিঁড়বে কী? চুল না থাকার কারণে ভগবানের উপর অভিমান হলো। হোটেল চলছে নিয়মিত। কিন্তু পথের দিকে চেয়ে থাকে– ওই বুঝি সুরঞ্জন আসে। 'ওই আসে ওই অতি ভৈরব হরষে'। তার এখন 'পথ চাওয়াতেই আনন্দ'। পাশের মিষ্টির দোকানের ক্যাসেট থেকে মাঝে মাঝে গান ভেসে আসে– 'বসে আছি পথ চেয়ে, ফাগুনেরও গান গেয়ে; যত ভাবি ভুলে যাব, মন মানে না'। গানটা যেন তার জন্যেই গাওয়া হয়েছে। সহ্য হয় না। সবাই যেন তাকে নিয়ে মশকরা করে।

এভাবেই চলে বিশ্বনাথের হোটেল। এক সন্ধ্যায় রান্না শেষ। সব কিছু গোছগাছ করে রাখছে বিশ্বনাথ। স্বভাবদোষেই পথের দিকে তাকায়। দেখে, সত্যিই সুরঞ্জন তার হোটেলের দিকেই আসছে। বিশ্বনাথের টাক মাথায় বাজ পড়ে। বন্‌বন্ ঘুরতে থাকে জগত। পড়ে যায় চৌকির উপর। সুরঞ্জন ঘরে ঢুকে ব্রাহ্মণকে ওই অবস্থায় দেখে কী করবে বুঝে উঠতে পারে না। মরে পড়ে আছে নাকি ভেবে কাছে গিয়ে বালিশ ছিঁড়ে নাকের কাছে তুলো ধরে। বুঝতে পারে শ্বাস চলছে। এভাবে রেখে চলে যেতেও পারছে না। বিবেকে বাধে। আবার সে খুনের আসামি না হয়ে যায়, সে ভয়ও জাগছে। অগত্যা জগ থেকে জল ঢেলে তাড়াতাড়ি মাথায় দিতে লাগল। খিলিপানের দোকানদার শ্রীনাথ, যে নাকি 'কত লীলা দেগলেম দেগলেম ঢাকার টাউনে' এই গান গেয়ে গেয়ে সুগন্ধি রঙিন পান বিক্রি করে বাজারে, সে গেছে খেতে। তার চক্ষু চড়কগাছ। সুরঞ্জনের কারণে বিশ্বনাথের হোটেল হুমকির মুখে। আর সে-ই কিনা মাথায় জল ঢালছে! শ্রীনাথ ভাবে– 'সর্প হইয়া দংশন করো, ওঝা হইয়া ঝাড়ো'। সেও এসে তাড়াতাড়ি পাখার বাতাস শুরু করে। পাখার বাতাস আর জলের ঝাপটার দৌলতে কিছুক্ষণ বাদে বিশ্বনাথের জ্ঞান ফেরে। চোখ মেলে। সামনে সুরঞ্জনকে দেখে (যেন যমদূতকে দেখছে) হঠাৎ চিৎকার দিয়ে ওঠে– সুরঞ্জন!

তারপর আবার চোখ বোঁজে। হাতের মুঠি শক্ত হয়ে যায়। দাঁতে কপাটি লাগে। মুখে গ্যাঁজলা ওঠে। বিশ্ব মাঝারে বিশ্বনাথ এবার পুরো অজ্ঞান। ভাব বেগতিক দেখে শ্রীনাথকে ফেলে সুরঞ্জন দিল চম্পট। শ্রীনাথের মাথা কাজ করে না। কী করবে বুঝতে পারে না। কিংকর্তব্যবিমূঢ় হলে সে স্বরচিত গান ধরে। তাই তাৎক্ষণিক রচিত গান ধরল– 'দয়াল বিনাদোষে বিশ্বনাথের খুনি করলে আমারে, ও দয়াল বিনা দোষে; ও দয়াল, ও দয়াল, ও দয়াল . . .

পরেশের শ্বশুরবাড়ি গমন

ক্ষৌরি করার সময় মুখের এক পাশ ক্ষুরের পোচে সামান্য কেটে গেল। ফুসকুরির মতো ওখান দিয়ে লালচে দানার মতো রক্ত বেরুচ্ছে। ঠিক যেন টকটকে ডালিমের কোয়া। কত লোকের চুল কাটে, ক্ষৌরি করে পরেশ। নিজেরটা ঠিকমতো করতে পারে না। আস্ত একটা বেকুপ মনে হচ্ছে নিজেকে। তাড়াহুড়োর বিষয় তো। তাছাড়া মনে উচাটন উচাটন একটা ভাব। পরেশের একটা থলি আছে। তাতে বেড়াল থাকে না, থাকে তার সরঞ্জাম। একটা ক্ষুর, একটা কাঁচি, একটা চিরুনি, একটা আয়না। আর আছে একটা ছোট্ট এ্যালুমিনিয়ামের বাটি, এক টুকরো সাবান। একটা লাইফবয় সাবানকে কেটে চার টুকরো করে ছোট্ট করে নেয়া। তাল মিশ্রির খণ্ডের মতো তিন কোণা এক টুক্‌রো ফিটকিরিও আছে। কাঁধে একটা গামছা। এই তার চলমান সেলুন। গ্রামে গ্রামে বাড়ি বাড়ি ঘুরে ঘুরে নরসুন্দরের দায়িত্ব পালন করে সে। এই তার পেশা। চার আনা, আট আনা, এক টাকা, দু'টাকা যে যা পারে দেয়। অবশ্য ফাউ কাজও করতে হয় দু'একটা। তা তো হবেই। সবার কাছ থেকে কি আর পয়সা নেয়া যায়?

পরেশের চেহারার মধ্যে একটা কায়দা আছে– হাসিহাসি-কান্নাকান্না ভাব। চার্লি চাপলিন মার্কা সামান্য গোঁফ আছে নাকের নিচে। সরু। জোঁকের মতো লেগে আছে ঠোঁটে। কেউ ভাবতে পারে পরেশ হাসছে, আবার কেউ ভাবতে পারে পরেশ কাঁদছে। দু'রকম অবস্থা একই সাথে। টু ইন ওয়ান। যে যার মতো ভাবতে পারে। ভাবনার স্বাধীনতা আছে। পরেশের একটু তোৎলানো স্বভাব আছে। বাক্যের প্রথম শব্দের প্রথম অক্ষরটা উচ্চারণ করতে বেগ পেতে হয়। যেমন 'চুল কাটবা নাকি ও বড় কাহা' –এ কথাটা বলতে গিয়ে প্রথমেই কতক্ষণ 'চু চু চু চু চু' করে তারপর বলবে 'কাটবা নাকি ও বড় কাহা'। পরেশকে যখন দেখতে আসে বিয়ের সময়, তখন ক্যাচাল লাগিয়ে দিয়েছিল সে। পাত্রীপক্ষ যখন জিজ্ঞেস করল– তোমার বাবার নাম কী? তখন কতক্ষণ 'ভো ভো ভো ভো ভো' করে ক্লান্ত হয়ে রণে ভঙ্গ দিল। 'ভোলানাথ' শব্দটা আর মুখ দিয়ে বেরুল না। তার বদলে বেরুল– জ জ জ জ জ ল্। জল পিপাসা পেয়েছিল। হয়ে গেল 'ভোজল'। নাম শুনে পাত্রীপক্ষের ভিরমি খাবার যোগাড়। বুদ্ধি করে সামলে নিয়েছিল পরেশ। তেমন কোনো দুঃখ-কষ্ট অবশ্য জায়গা পায় না পরেশের মনে। দুঃখ-কষ্ট পাওয়ার কোনো কারণ খুঁজে পায় না সে। বিষয়টা তার কাছে ফালতু মনে হয়।

যে যা দেয়, পরেশ খুশি। তবে কারো ছেলে-মেয়ে হ'লে বা বিয়ে হ'লে পরেশের লাভ। এ সব কাজে তার কদর, নাপিত লাগবেই। এতে ভালো পাওয়াও যায়। পাঁচ টাকার কম কেউ দেয় না। কেউ কেউ লুঙ্গি-গামছাও দেয়। ছেলে হ'লে একটু বেশি খাতির। মেয়ে হ'লে মনটা বেজার থাকে। আর একটা কাজে পরেশের বেশ কদর– শ্রাদ্ধ হ'লে। কেউ মারা গেলে পরেশকে খবর দিতে হয় না, ডাকতে হয় না– দিন-ক্ষণ-তারিখ হিসেব করে যথাসময়ে গোলাম হাজির। এ তিন গ্রামে তার বিকল্প কেউ নেই। কাজ শেষে খাবারটা জম্পেস হয়। সকাল থেকে লেগে যায় কাজে। দাড়ি কাটা, চুল ছাটা, গোঁফ ছাটা। তাছাড়া যাদের বাবা কিংবা মা মারা যায় তাদের ন্যাড়া করে দেয়া। যার কোনো দরকার নেই, সেও একটু কানের চুল কাটে, নাকের লোম কাটে। নইলে নখ কাটে। কথায় বলে 'নাপিত দেখলে নখ বড় হয়'। রোজগার খারাপ না। এভাবেই তার চলে।

পরেশের হাতে ক্ষৌরি হওয়া মানুষ এখন জজ, ম্যাজিস্ট্রেট হয়েছে। মাস্টার হয়েছে। বিচারপতি হয়েছে। পুলিশ হয়েছে। চৌকিদার হয়েছে। চোরও থাকতে পারে। এদের চুলও কেটেছে সে। এক নামে সবাই তাকে চেনে। এটা তার গর্বের বিষয়। কেউ কেউ বিড়ি দিয়ে খাতিরও করে। চা-ও খাওয়ায় মাঝে মধ্যে কেউ কেউ দু'এক কাপ। একটা দুঃখ অবশ্য তার আছে– কেউ তাকে আপনি ক'রে কথা বলে না। ছেলে-ছোকরারাও নাম ধরে ডাকে। তুমি তুমি ক'রে কথা বলে। নাপিত বলে কি সে মানুষ না? সে কি গুবরে পোকা? আর একটা দুঃখ তার আছে– নিজের চুল নিজে কাটতে পারে না। ক্ষৌরি করতে পারে। এ হেন পরেশের ক্ষৌরি করার সময় নিজের গাল কেটে গেল। লোকে টের পেলে বলবে– গালকাটা পরেশ। চিন্তার বিষয়।

এ অবস্থায় পরেশের কী করা উচিত তা সে ভেবে পায় না। বিষয়টা খুব জটিল নয়, কিন্তু তার কাছে বড্ড ঘোলাটে মনে হয়। গোবরজল গোলা বালতিতে পড়া নেংটি ইঁদুরের মতো লাগছে নিজেকে। হিসেবটা সহজ, কিন্তু মেলে না। সে মুস্কিলে পড়ে যায়। সমস্যাটা বেঁধেছে তার শ্বশুরবাড়ি যাওয়া নিয়ে। যখন বিয়ে করেছিল

তখন ছিল বর্ষাকাল। এখন শুকনার সময়। পৌষ মাস। 'কারো পৌষ মাস, কারো সর্বনাশ'। পরেশের সর্বনাশ। বউ গেছে বাপের বাড়ি ক'দিন আগে। আজ তার যাওয়ার কথা। নতুন জামাই। পৌষ-সংক্রান্তি। পিঠে-পায়েস খাবে। কিন্তু এই যাওয়া নিয়েই পড়েছে সে বিপাকে। হেঁটে গেলে ঘণ্টাখানেক লাগে। দুই আড়াই মাইলের পথ। সেটা কথা না, কথাটা অন্যখানে। তার বাড়ি আড়ুয়াকান্দি। পরের গ্রাম দিঘিরপাড়, তারপর কদমবাড়ি, এরপরই লক্ষ্মীপুর। ওখানেই তার শ্বশুরবাড়ি। পায়ে হাঁটা পথ। সরু কাঁচা রাস্তা। যেতে কোনো সমস্যা নেই। কিন্তু পরেশ পায়ে হেঁটে শ্বশুরবাড়ি যায় কী করে– এটাই সমস্যার। তার খুব শখ বাসে চড়ে শ্বশুরবাড়ি যায়। বাসে চড়ে শ্বশুরবাড়ি যাওয়ার মধ্যে একটা গৌরব আছে। আভিজাত্য আছে। কিন্তু ওরাস্তায় বাস-ট্রাক তো দূরের কথা রিক্সা-ভ্যানও চলে না। দু'একটা সাইকেল যে চলে না তা নয়, তবে আরোহীকে প্রায়ই খানাখন্দে পড়তে হয়। কোনো গরুর গাড়িও নেই এ রাস্তায়। এটাই পরেশের বিপদ। সে ধন্দে পড়ে। অবশ্য এরকম ধন্দে সে প্রায়ই পড়ে।

অনেক চিন্তা-ভাবনা করে একটা উপায় বের করেছে পরেশ। মাইল তিনেক হেঁটে গেলে সাতপাড় বাজার। বিলরুট ক্যানেল দিয়ে লঞ্চ চলে। লোকে অবশ্য চান্দার বিলের খাল বলে। চাঁদ সওদাগরের বাণিজ্য তরীর বহর নাকি এই বিলেই ডুবেছিল, এরকমই শোনা যায়। সে অবশ্য একদিন একখানা ভাঙা তক্তা ভেসে যেতে দেখেছিল। তার ধারণা ওটা চাঁদ সওদাগরের নৌকার তক্তা হতে পারে। যা হোক, এই নদীর পাড়েই সাতপাড় বাজার। এখান দিয়ে লঞ্চ চলে যায় টেকেরহাট, মাদারীপুর, ঢাকা। টেকেরহাট থেকে বাস যায় রাজৈর, মাদারীপুর, বরিশাল। রাজৈর থেকে চৌরিবাড়ি হয়ে বিলের মধ্যে দিয়ে হাঁটা পথে লক্ষ্মীপুর মাত্র মাইল সাতেক হবে। পরেশের মনে ধরল পরিকল্পনাটা। সে ঠিক করল প্রথমে পায়ে হেঁটে সাতপাড় যাবে। ওখান থেকে লঞ্চে উঠবে। লঞ্চে গিয়ে নামবে টেকেরহাট। সেখান থেকে বাসে চরে রাজৈর। রাজৈর থেকে আবার হেঁটে শ্বশুরবাড়ি লক্ষ্মীপুর। তাতে অবশ্য বেশ টাকা খরচ হবে। অনেক সময়ও লাগবে। তা লাগুক না– শ্বশুরবাড়ি যাওয়া নিয়ে কথা। বাসে না গেলে যে তার মান থাকে না। তাছাড়া শখ বলেও কি তার কিছু নাই? গরিব বলে কি বাসে চড়ার সাধও থাকবে না? শ্বশুরবাড়ি সে বাসেই যাবে।

সকালবেলা ঘুম থেকে উঠে ক্ষৌরি করে হাতমুখ ধুয়ে ধুতি-পাঞ্জাবি পরে শ্বশুরবাড়ি লক্ষ্মীপুর রওনা দিল পরেশ। বাসে চড়ে শ্বশুরবাড়ি যাবার উত্তেজনায় রাতে ভালো ঘুম না হলেও ঘুমঘুম ভাবটা নাই। কুয়াশা ভেদ করে নতুন বৌয়ের মতো সবে মিষ্টি রোদ উঁকি মারছে ডাল-পাতার ফাঁক দিয়ে। কী একটা পাখি কিউ কিউ করছে। উত্তর থেকে মিহি হাওয়া বইছে। ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা। বাতাসে সকালবেলার খেজুর রসের গন্ধ ম' ম' করছে। বাড়ির পাশের ক্ষেত থেকে ধ'নে পাতার টাটকা গন্ধ ছুটে আসছে নাকে। বেশ মধুর লাগল। সকালের হাওয়ার মতো মনে বেশ একটা ফুরফুরে ফুর্তি। নিজকে আর নাপিত মনে হচ্ছে না, জামাই জামাই মনে হচ্ছে। নাপিত শব্দটা অবশ্য তার পছন্দ নয়। লোকে কেন যে নাপিত বলে? নরসুন্দর কথাটা বেশ মিষ্টি। পরেশ কখনও গান করে না। আজ সে গুণগুণ করে একটা সুর ভাঁজছে। কোন গানের কী সুর তা সে জানে না। স্বরচিত। সকালে অবশ্য কিছু খেল না। যেতে যেতে ক্ষিদেটা একটু চাঙ্গা হ'লে শ্বশুরবাড়ি গিয়ে বেশি করে খেতে পারবে পিঠে-পায়েস।

তিন মাইল হেঁটে পরেশ প্রথমে পৌঁছল সাতপাড় বাজার। তাকিয়ে দেখল, সে যখন সাতপাড় বাজারে পৌঁছল তখনই ভেঁপু বাজিয়ে লঞ্চটা ছেড়ে গেল। পেছন পেছন দৌড়ল কিছুক্ষণ। কাজ হলো না। লঞ্চ থামল না। পরেশের ধারণা– লঞ্চের সারেং তাকে দেখতে পায় নাই। পরেশকে দেখলে না থামিয়ে পারতই না। লঞ্চটা তখন হাঁসের মতো মাঝ নদীতে সাঁতার কাটছে। আর এক ঘণ্টা পর পরের লঞ্চ। অপেক্ষা ছাড়া উপায় কী? এই অবকাশে পরেশ ভাবল শ্বশুরবাড়ি কী নেয়া যায়। কত জনই তো কত কিছু নেয়। কেউ নেয় দই-মিষ্টি। কেউ নেয় লাউ-কুমড়া-নারকোল। কেউ কেউ হাঁস-মুরগি-মাছও নেয়। পরেশ ওসব কিছু নেবে না। যা কেউ নেয় না, পরেশ তাই নেবে। সবাইকে একটা চমক লাগিয়ে দেবে। বাজারে এদিক সেদিক ঘুরল কিছুক্ষণ। অবশেষে পেল একটা পছন্দের আনকমন জিনিস। রামদা'। পঁয়তাল্লিশ টাকা দিয়ে একটা রামদা' কিনে ফেলল। বাসে চড়ে শ্বশুরবাড়ি যাওয়া বলে কথা। রামদা' কেন কিনল, কী করা হবে তা দিয়ে কিংবা শ্বশুরবাড়ির সাথে রামদা'র কী সম্পর্ক– এ সব কোনো কিছু না ভেবেই সে কিনে ফেলল ঝা চকচকে আড়াই হাতি এক রামদা'।

ভাবাভাবির ধার ধারে না সে। ক্লাস টু পর্যন্ত পড়েছিল পরেশ। আর মাত্র আট ক্লাস পড়লেই মেট্রিক। তা আর হলো না। সবাই বাবু হলে চুল কাটবে কে? প্যান্ট-শার্ট পরে স্যান্ডেল পায়ে দিয়ে প্রতিদিন স্কুলে যেতে তার লজ্জা লজ্জা লাগত। তাছাড়া পড়া না পারলে স্কুলে বেতের ভয়ও আছে। আর স্কুলে খালি নীতি কথা শিখায়। অত নীতি কথা তার ভালো লাগে না। পণ্ডিতমশাই প্রায়ই ওই কথা বলতেন– 'ভাবিয়া করিও কাজ, করিয়া ভাবিও না' –এ আপ্তবাক্য পরেশের বেলায় খাটল না। জগতটা কি পরীক্ষার হল? সে কি পরীক্ষার হলে পরীক্ষা দিচ্ছে নাকি যে অত ভাবাভাবি করতে হবে? তার মনে হয় 'করিয়া ভাবিও কাজ, ভাবিয়া করিও না' –এটাই ভালো। তাই কোনো ভাবাভাবির ধার না ধেরে রামদা' কিনে ফেলল।

নদীজল কেটে কেটে এক সময় লঞ্চ এল। ঘাটে ভিড়ল। সিঁড়ি বেয়ে পরেশ উঠল। ভোঁ করে আবার ছেড়েও দিল। একটা যুতসই জায়গা খুঁজে সে বসে পড়ল। ঘণ্টা দেড়েক পরে নামল টেকেরহাট বন্দর। এবারে বাসের জন্য অপেক্ষা। এই অবসরে কিনল বড় বড় চারটে বেল। পাকা বেল। তারপর সেই বহু আকাঙ্ক্ষিত বাসে চড়া। বহু আগে আরেকবার বাসে চড়ে কোথায় যেন গেছিল। সে স্মৃতি এখন ধূসর। আবার স্বপ্নও হতে পারে। ভালো করে মনে করতে পারছে না। একটা সিট খুঁজে আয়েস করে বসে ভাবতে লাগল সে সত্যি সত্যি বাসে চেপে শ্বশুরবাড়ি যাচ্ছে। তার স্বপ্ন পূরণ হলো। মনে পুলক, ঠোঁটে মৃদু হাসি। এর ওর মুখের দিকে তাকিয়ে পরেশ ভাবে– দেখুক সবাই। পরেশ শ্বশুরবাড়ি যায়। যতবার গাড়ির হর্ন বাজে ততবার পরেশ কেঁপে কেঁপে ওঠে। বুঝে উঠতে পারে না, এত জোরে বাঁশি বাজানোর দরকারটা কী? আর সামনের দিক থেকে আসা বাস দেখলেই তার মুখ শুকিয়ে মমি। জল তেষ্টা পায়। বুক ধরাস ধরাস করতে থাকে– এই বুঝি লাগল ঠক্কর। সব শেষ। শখ করে বাসে চেপে শ্বশুরবাড়ি যাবে, তা না দেখা যাবে যমেরবাড়ি গিয়ে হাজির। লাশটা গিয়ে পৌঁছাবে শ্বশুরবাড়ি। ভয়ে চোখ বুঁঝে থাকে। আর বউয়ের মুখটা মনে করতে চেষ্টা করে। শ্বশুরের নাম জপে। তারপর চোখ মেলে দেখে– কীভাবে যেন বাসটা পাশ কাটিয়ে চলে গেছে। পরেশ যেন হাতের মুঠোয় প্রাণ ফিরে পায়। শ্বশুরকে ধন্যবাদ।

বাসের সিটটা গদির মতো। পাছা ডুবে যায়। অভ্যেস নেই তো, তাই 'পড়ে যাবো পড়ে যাবো' মনে হয়। শ্বশুরবাড়ি গিয়ে সে সবাইকে তাক লাগিয়ে দেবে। টিকিটটা যত্ন করে পকেটে রেখেছে। গল্প করতে পারবে যে সে বাসে চড়ে শ্বশুরবাড়ি এসেছে। এ সব ভাবতে ভাবতে আধাঘণ্টার মধ্যেই রাজৈর চলে এল। নেমে ভাবল এখান থেকেও একটা কিছু নেয়া যাক। বাসে চেপে শ্বশুরবাড়ি আসা বলে কথা। এক হাঁড়ি খেজুরের গুড় কিনল। যদিও রামদা' বেল আর গুড় ঠিক সমগোত্রীয় জিনিস নয়। মিল নেই। তারপর হাঁটা শুরু করল কাঁচা রাস্তায়। মাইল দুই হেঁটে তবে মেঠো পথে মাইল পাঁচেক গেলেই শ্বশুরবাড়ি লক্ষ্মীপুর। এ আর তেমন কী? ছেলেবেলায় ওরকম কত হেঁটেছে। দশবারো মাইল হেঁটে পৌষের রাতে কত যাত্রা দেখতে গেছে। আবার কুয়াশায় ভিজতে ভিজতে ভোর রাতে বাড়িও ফিরেছে। এ সব তার গা সওয়া। বেশ ফুর্তি সহকারে চলল পরেশ। হাতে রামদা' বেল আর গুড়।

পরেশের কিঞ্চিৎ দেরি হয়েছিল শ্বশুরবাড়ি পৌঁছুতে। সকালবেলা দিল রওনা। যখন মেঠো পথ ধরল তখন বিকেল। সূর্য পাটে বসেছে। কনে নেই, তবে কনে দেখা আলো ছড়িয়ে আছে মাঠে। কারা যেন নাড়া পোড়াচ্ছে। ধোঁয়ায় ঢেকে আছে পথ। নাড়া পোড়া গন্ধ ভালো লাগে পরেশের। ছোটকালে নাড়ার আগুনে কত শালুক পুড়িয়ে খেত– মনে পড়ল। বিলের পথটা তার ঠিক চেনা নয়। কিছুদূর যাবার পর আবিষ্কার করল– পথে কাদা আছে। ভালো করে এখনও শুকায় নি। শীতকালের সূর্য টুপ করে ডুবে গেল। ছেলেবেলায় রাতকানা রোগে ভুগেছিল সে। রাতে তাই চোখে দেখে কম। পায়ে অবশ্য চপ্পল নেই। নেই তা নয়, ছিল। বাসে উঠে চিন্তায় যখন মশগুল, তখন চটি খুলে সামনের সিটে পা বাঁধিয়ে আরাম করে ভাবছিল। বাস যখন থামল তখন তড়িঘড়ি নামতে গিয়ে চটির কথা মনেই ছিল না। এই যা। চটি তার ছিল। শ্বশুরবাড়ি আসছে, চটি থাকবে না– এটা লোকে ভাবে কী করে? সে কি এতই বোকা?

পরেশের পথ কণ্টকাকীর্ণও নয়, কুসুমাস্তীর্ণও নয়, মাখন মাখন। মানে কর্দমাক্ত। পথঘাট না চেনার কারণে মাঝে মাঝে হোঁচটও খেতে হয়। পায়ে পচা শামুক পড়েছিল কিনা জানে না, তবে পা কেটেছে। অন্ধকারে দেখা না গেলেও, জ্বালা টের পাওয়া যায়। হাতে কাদা লাগায় তা নাকে মুখেও সংক্রমিত হয়েছে। সে এক কাহিনি। ধুতি-পাঞ্জাবির অবস্থা কার্তিকের মতো। পুজোর আগে মাটির শেষ পোচ। মেটে কার্তিক। কার্তিক

ঠাকুরের হাতে তীরধনুক নয়, খড়গ নয়– রামদা'। রক্তাক্ত নয়, কর্দমাক্ত। গুড়াক্ত। গুড়ের হাঁড়ি আগেই ভেঙেছে। গুড়ে আর কাদায় মিশে কাদাকাদি। একাত্ম। গুড় পড়ে থাকল মাঠে। মাটিকে ভালোবেসে শুয়ে থাকল মাটিতে। বেল আর রামদা' হাতে সে যেন 'ছিনাথ বহুরূপী'। অতি কষ্টে খুঁজে খুঁজে শ্বশুরবাড়ির উঠোনে এসে ল্যান্ড করল পরেশ। পদধূলি নয়, পদকাদা ঝাড়ল। আজগুবি এক সঙ। কে একজন বাতি হাতে যায় এঘর থেকে ওঘর। রাতকানা পরেশ ডাকে– মা ঠাইরেন, এইডা কি পরান শীলের বাড়ি? কণ্ঠস্বরটা চেনা চেনা মনে হলেও লোকটাকে কেমন কেমন যেন লাগল পরেশের বউয়ের। হাতে রামদা'। ডাকাত নাকি? ভয়ে হাত থেকে ছিটকে পড়ে গেল পিদিম। মুখ দিয়ে একটা আর্ত চিৎকারের মতো বেরুল। লোকজন ছুটে এল। মেটে কার্তিককে চিনে নিতে কষ্ট হলো না কারোরই। পরেশের ভাগ্য ভালো– অন্ধকারেও জামাই চেনা যায়। তাই রক্ষে। সে তখন ঠকঠকে কার্তিক।
পৌষের শীত। কনকনে ঠাণ্ডা। কুয়াশায় ঝাপসা সব। গাছপালা যেন চাদর মুড়ি দিয়ে বসে রয়েছে শীতে। কিন্তু উপায় কী? পরেশকে পুকুরেই নামতে হলো। এর চেয়ে মরণও ভালো। ডুব দিয়ে আর জাগতে ইচ্ছে হলো না। কিন্তু বেশিক্ষণ থাকতেও পারে না। ভোস করে ভেসে ওঠে। শীতে জমে যাচ্ছে হাত-পা। পরেশ ভেবে পায় না– এই শীতে মাছ থাকে কীভাবে জলের তলে? শ্বশুরবাড়ির লোকজন বাইরে সমবেদনা জানালেও কেউ কেউ মুখ টিপে হেসেছে। সে অত বোকা না। সে তো আর ঘাসে মুখ দিয়ে চলে না। সব খেয়াল করেছে। একমাত্র তার বউ শশীমুখীই কেঁদেছে তার এ দুর্দশায়। এ কি কম লজ্জার? তার কি মান-সম্মান নাই? সে কি ঢেউ টিন? এলাকায় তার একটা সুনাম আছে। 'পরেশ নাপিত' বলতে এক ডাকে সবাই তাকে চেনে। কয়েক প্রকার চুলের ছাট সে জানে। টেরলিং কাট, ঘেরি কাট, বব কাট, বচ্চন কাট। বাচ্চা বাচ্চা ছেলেমেয়েদের চুল ছাটার সময় কেউ সুড়সুড়ি পায় না। কেউ তাকে ভয় পেয়ে দৌড়ও দেয় না। সেই পরেশের এ হেন দুর্গতি! গ্রহের ফের। স্রেফ কপাল।
স্নান সেরে ঘরে এসে গায়ে একটা চাদর জড়িয়ে দেখে শালী পুলিপিঠা নিয়ে হাজির। কী যে ভালো লাগল। এই না হ'লে শ্বশুরবাড়ি। একেই বলে বুঝি জামাই-আদর। শ্বশুরবাড়ি 'ভারি মজা কিল-চড় নাই'। ক্ষিদেটা অজগর সাপের মতো মোচড় দিয়ে উঠল পেটের ভিতর। সারাদিন খাওয়া হয় নি কিছুই। 'পথের ক্লান্তি ভুলে স্নেহভরা হাতে তুলে' মুখে দিল পুলিপিঠা। তাড়াতাড়ি একটা পিঠা তুলে মুখে পুরেই কামড়। গোগ্রাসে চিবানো শুরু করল। সাথে সাথে কানে হাত। চোখে জল। চিৎকার। জল জল। ঝাল ঝাল। জিভ পুড়ে গেল। শালী খিলখিল হেসে ছুটে দৌড়ে পালাল। পরেশের ভাগ্যটা টক-ঝালে মেশা জলের বদনা।
তিড়িং বিড়িং করতে করতে মনে মনে পরেশ এই সিদ্ধান্ত নেয় যে, সে আর কোনোদিন বাসে চড়ে শ্বশুরবাড়ি আসবে না। পরেশ বাসে আসিয়া সিদ্ধান্ত নিল যে সে আর বাসে আসিবে না।

ইদ্রিসের কবর

ইদ্রিস নিশ্চিত যে ওটা তারই কবর। এতে কোনো ভুল নাই। একশো ভাগ শিওর। তার জন্যেই খোঁড়া হয়েছে কবরটা। ইদ্রিসের চোখে কোনো ঘুম নাই আজ তিন দিন। যে কোনো সময় তার মৃত্যু। অনিবার্য। কালো বেড়ালের মতো মৃত্যু হামাগুঁড়ি দিয়ে এগিয়ে আসছে তার দিকে। ইদ্রিস দেখতে পাচ্ছে, ছায়ার মতো তার চারপাশে ঘুরছে মৃত্যু। কবর খোঁড়া হয়ে গেছে। দেড় হাত বাই সাড়ে তিন হাত। মৃত্যু না বলে খুন বলা যৌক্তিক। কারণ এটা বার্ধক্যজনিত মৃত্যু নয়, বয়স তার মাত্র পঁয়তাল্লিশ। এ বয়সেও মানুষ আরও তিনটে বিয়ে করতে পারে। সে মাত্র একটা করেছে। আর একটাকে অবশ্য বিয়ে বলা চলে না। অন্য কায়দা। রোগে ভুগে অসুস্থ হয়ে মৃত্যু নয়। সে স্বাস্থ্যবান। এমনকি ইচ্ছামৃত্যুও নয়। পরিকল্পিত খুন। কথাটা ঠিক হলো না। খুন তো এখনও হয় নি সে। দু'একদিনের মধ্যেই হবে। বলা যায়, খুনের পরিকল্পনা। কিংবা সম্ভাব্য খুন। হত্যার হুমকি মারা হয়েছে তাকে। অতএব স্বাভাবিক মৃত্যু ভাবার কোনো কারণ নাই। এটা জোর-পূর্বক মৃত্যুর কেস।

আসুক মৃত্যু। উপরে উপরে 'ভয় কী মরণে' গোছের একটা ভাব ইদ্রিসের। সে হাঁটতে হাঁটতে কবরে যাবে। মেরে ফেলার আগেই সে কবরে গিয়ে শুয়ে পড়বে। তার জন্য খোঁড়া নির্ধারিত কবরে। টাকি মাছের মতো সটান শুয়ে থাকবে। তারপর ওরা মাটি চাপা দিক। ছাই চাপা দিক। মুখে আগুন দিক। কবরে ফুলগাছ লাগাক, তালগাছ লাগাক– যা খুশি করুক। তার কিছু যায় আসে না। বীরের মতো মৃত্যু যাকে বলে। লোকে দেখুক। সবাই বলুক ওই যে ইদ্রিস যায় বীর রুস্তমের মতো কবরে যায় হেঁটে হেঁটে। ইদ্রিস ভীতু নয়, কাপুরুষ নয়। বাস্তবে কিন্তু ঘটল অন্য কেস। ভোরবেলা ইদ্রিস পা ঠক্‌ঠক্ করে কাঁপতে কাঁপতে এসে পায়ে পড়ল– স্যার, আমারে বাঁচান। কালু শেখ আমারে মাইরা ফেলাবে। কবর খোঁড়া শ্যাষ। এইমাত্র দেইখ্যা আসছি আমার কবর, দেড় হাত বাই সাড়ে তিন হাত। সাইজ ঠিক আছে। পাশে শুইয়াও দেখছি, আমার সমান সমান মাপ মতো অয়। তয় গভীর কম। আর এট্টু গভীর অইলে ভালো অইত। নয়ত লাশ শিয়ালে খাবে। কুকুরেও খাইতে পারে। অহোন কী উপায়?

বনবাসে থাকি আমরা পঞ্চ পাণ্ডব– আমি, নীরেন, মুনির, হাবিব আর আখতার। শুধু দ্রৌপদী নেই। সদ্য চাকরিতে যোগদান করা পাঁচ ব্যাচেলর শিক্ষক। চারদিকে ঝোপঝাড় জঙ্গল, মাঝখানে দু'টো ঘর। একটাতে আমি আর নীরেন। অন্যটাতে মুনির, হাবিব আর আখতার। ভাণ্ডারিয়া সরকারি কলেজে পোস্টিং। সকালে কলেজে যাই। দুপুরে ফিরে এসে খেয়েদেয়ে ঘুম। বিকেলে কলেজের মাঠে কনে দেখা আলোয় কনের দেখা তো আর মেলে না, তাই আকাশ দেখা। তারপর রোদটা পড়ে এলে– একটা দু'টো করে তারা ফোটা শুরু করলে উঠে পড়ি। বেরিয়ে পড়া দিগ্বিজয়ে। মাইলের পর মাইল হাঁটা। এটাকে স্বাস্থ্য-সচেতন হাঁটা বলে না, ঘুরে বেড়ানো বলে। বনবাসে শান্তির রসদ। কতদিন জঙ্গলে পথ হারিয়েও ফেলেছি। 'ডাকাত' বলে লোকজন তেড়ে এসেছে। মার দেয়ার আগেই চিনে ফেলেছে আমাদের। পরে পথ দেখিয়ে দিয়েছে। রাত হলে তবেই ঘরে ফেরা। খাওয়া-দাওয়া। পাখির মা রান্না করে রেখে ঘরে তালা ঝুলিয়ে চলে যায়। আমরা ফিরে খাই। ঠাণ্ডা ভাত নীরেনের পছন্দ নয়। তাই স্টোভ জ্বেলে খাবার গরম করে নেয়া তার নৈমিত্তিক ব্যাপার। শীতকাল হলে তো কোনো কথাই নেই। গরম গরম খাওয়া শেষ, 'তারপর নিরালা নিঝ্‌ঝুম অন্ধকার'। ঘুম। সকালে আবার কলেজ।

এক বিকেলে কলেজের মাঠে ঢুকছি। সটান চিৎ হয়ে শুয়ে আকাশ দেখছে কলেজের নাইটগার্ড ইদ্রিস। মুখভর্তি দাড়ি। তার মাঝখানে উন্মিলিত দু'টো চোখ। আমরা কাছে যেতেই দেখলাম ইদ্রিসের চোখ দু'টো বন্ধ হয়ে গেল। গভীর ঘুম। নাকও ডাকছে। আমরা মাঠে পা দিতেই আমাদের সাড়া পেয়ে ইদ্রিসের চোখ বন্ধ হয়ে গেছে। কারণ অবশ্য আছে। চা সিগারেট আনতে বলতে পারে। চেয়ারগুলো মুছে দিতে বলতে পারে। অন্য কোনো ফরমায়েশ করতে পারে। ইদ্রিস ওসব করবে না। সে তো পিওন না, নাইটগার্ড। ওসব সে করবে কেন? তার স্ট্যাটাস আছে না? কুঁড়ের বাদশা। যেখানে স্বার্থ নেই, সেখানে ইদ্রিস নেই।

তিন ছেলের বাপ ইদ্রিস। বাড়ি পিরোজপুর। তিন ছেলে নিয়ে বউ থাকে সেখানে। উঠোনে কয়েকটা সুপারি গাছ আছে, পেয়ারা গাছ আছে। তা থেকে আয় সামান্য কিছু। মাসে দু'একবার বাড়ি যায়। এখানেই কাটে বেশির ভাগ সময়। স্বপাকে খায়। কাউকে পাত্তা দেয়া তার ধাতে নেই। প্রিন্সিপ্যাল রজব আলি একদিন তাকে কী একটা কাজে বলেছিল, সে বদমায়েশি করে অন্য একটা করেছে। রজব আলি ধমক দিয়ে বললেন– ইডিয়েট। কোনো কথা না বলে ইদ্রিস মাঠে চলে গেল। ফিরে এল দু'খানা ইট নিয়ে। রজব আলির মেজাজ চরমে– এ সব কী, কে আনতে বলেছে? ইদ্রিস বলে– স্যার, আপনিই তো আমাকে ইট আনতে বললেন। বললেন না, ইট আন?
ইদ্রিসের ওভার ডিউটি ছিল আমাদের বাসায়। তার দু'টো কারণ ছিল। একটা কারণ, প্রতি সকালে বাজার করে দেয়া। অন্যটা পাখির মা। বাজার করতে যাওয়া-আসার জন্য তাকে দশ টাকা রিক্সা ভাড়া এবং আরও দশ টাকা বখশিশ দেয়া হত প্রতিদিন। যদিও সে হেঁটে হেঁটেই যেত এবং হেঁটে হেঁটেই আসত। এ ছাড়াও তার উপরি পাওনা ছিল দশ টাকার কাঁচা কলা বাড়িয়ে বারো টাকা বলা, মরিচের কেজি ত্রিশ টাকার জায়গায় বত্রিশ করে দেয়া– এ সব আর কি। বুঝলেও আমরা কিছু বলতাম না। সেও বুঝত যে আমরা ওসব বুঝি। অন্য আকর্ষণটা পাখির মা। বয়সে ইদ্রিসের চেয়ে কম নয়। তা হোক রসালাপ তো চলতে পারে? তা ছাড়া মেয়েদের আবার বয়স কী? ইদ্রিসের মুখ ভর্তি কালো কালো দাড়ির ফাঁকে সাদা সাদা দাঁতগুলো হাসলে কেমন ঝকমক করে ওঠে। তার মূল্য কি কম? পান খেয়ে পাখির মা ঠোঁট টুক্‌টুকে করে। ইদ্রিসও তার ভাগ পায়। পাখির মা রান্না করে। ইদ্রিস চুলার কাছে বসে থাকে। চুলার আঁচে ইদ্রিসের মুখ লাল হয়ে যায়। আগুনের হল্‌কায় দাড়ি চকচক করে ওঠে। ইদ্রিসকে অন্য মানুষ মনে হয়। সে বসে থাকে। বসে থাকাতেই তার আনন্দ।
ইদ্রিসের কবর খোঁড়া হয়েছে। খবরটা শুনে আর চুপচাপ হাত গুটিয়ে বসে থাকা যায় না। শত হোক কলেজের নাইটগার্ড। আবার বাজারটা তার দয়ায়। ইদ্রিস আমাদের নিয়ে গেল সদ্য খোঁড়া কবরের কাছে। কথা মিছে নয়। সত্য। কবর খোঁড়া হয়েছে। টাটকা। মাটি এখনও আলগা। ভিজে ভিজে। বিস্তারিত জানা গেল ইদ্রিসের মুখে। কালু শেখ প্রভাবশালী ছাত্রনেতা। দলবল নিয়ে কলেজের এক রুমে প্রতি রাতেই প্রায় মদের আড্ডা বসায়। নয়ত কল্কে। গাঁজা। মাঝে মধ্যে অন্য বিষয়ও থাকে। কয়েকদিন আগে রাতের অন্ধকারে কলেজ ক্যাম্পাসের বড় বড় কয়েকটি মেহগিনি গাছ কেটেছে। রাতের অন্ধকারেই সেগুলো পাচার হয়ে গেছে করাতকলে। ইদ্রিস দেখে ফেলে। ওরাও ইদ্রিসকে দেখে ফেলে। তাই তাকে শাসানো– যদি কাউকে বলে দেয় তবে ইদ্রিসকে জ্যান্ত কবর দেবে। ইদ্রিস তওবা করে, নাকে খত দেয় যে কাউকে বলবে না।
তবুও কী এক অজানা ভয় ইদ্রিসকে তাড়া করে ফেরে। স্যান্ডেলের মতো মৃত্যু তার পায়ে পায়ে জড়িয়ে। সকালবেলা বাথরুম করতে গিয়ে ইদ্রিস দেখে কলেজের পিছনে সত্যিই তার কবর খোঁড়া হয়েছে। পায়খানা পেচ্ছাব ইদ্রিসের মাথায় উঠে গেছে। কণ্ঠ শুকিয়ে কাঠ। শালিখ পাখির ছা'য়ের মতো চিঁ চিঁ স্বর ঝরে। হাত-পা নিথর। হাঁটু কাঁপতে কাঁপতে কোনোমতে আমাদের কাছে এসে পৌঁছানো। তারপর চোখের জলে নাকের জলে বিত্তান্ত পেশ। সদলবলে আমরা হাজির হলাম অকুস্থানে। ভেতরে কোনো লাশ নেই, তবু আমরা ক'জন মোনাজাতের ভঙ্গিতে দাঁড়ানো কবরের সামনে। কী করা যায়, বুঝে উঠতে পারছি না।
নীরেন তখন মনোযোগ দিয়ে বেশ ক'দিন ধরে শার্লক হোমস্ পড়ছিল। কোনো এক জন্মদিনে আমার এক বন্ধু আমাকে ওটা গিফ্‌ট করেছিল। সে গোয়েন্দাকাহিনিতে নিমগ্ন। সেই দৃষ্টিভঙ্গিতে নীরেন খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখছিল আর নানা রকম প্রশ্নবাণে ইদ্রিসকে জর্জরিত করছিল। খুনের মোটিফ বের করা কিংবা হত্যার মোটিফ অন্য রকম কিনা এটাই বের করা তার একমাত্র উদ্দেশ্য। এই যেমন সম্পত্তি নিয়ে তোমার সাথে কারো কোনো গোলোযোগ আছে কি না? যাকে তুমি এখনও স্ত্রীর মর্যাদা দাও নি তার সাথে সম্পর্কের অবনতি চলছে কিনা? তোমার স্ত্রীর সাথে কারো পরকীয়া সম্পর্ক আছে কিনা? কালু শেখ কোন্‌ভাবে ডায়লগ আই মিন হত্যার হুমকি দিয়েছিল– ইত্যাকার নানা রকম জেরা চলছিল। আর ইদ্রিস অজানা আতঙ্কে আরও বেশি বেশি কাহিল হয়ে পড়ল। এরপর তিন দিন ইদ্রিসের স্নান খাওয়া ঘুম পায়খানা পেচ্ছাব বন্ধ। ইদ্রিস এখন থেকেও নেই। জীবন্ত লাশ। না মরেও মৃত।

শহরে ঘটনাটা রটনা হয়ে গেল। সাংবাদিকরা নানা প্রশ্ন করতে লাগল। কিন্তু ইদ্রিস আর কারো কাছে মুখ খুলল না। মুখে তার কুলুপ। দৈনিক 'গণ ধোলাই' পত্রিকার শিরোনাম 'ইদ্রিসের কবর : অজানা রহস্য'। দৈনিক 'লাঠি সাপ্টা' পত্রিকার শিরোনাম 'ভূতুড়ে কাণ্ড'। রাতের গাছ কাটার কথা আর কাউকে বলল না। আমরা চিন্তিত। নীরেন কিন্তু শুধু চিন্তা করেই ক্ষ্যান্ত দিল না। 'গভীর রাতে, ভোরবেলা আধো অন্ধকারে, কখনও বৈকালে ঝিকিমিকি আলোয় ছায়ায়, হঠাৎ সন্ধ্যায়' কলেজের কোনো রুমে চুপ করে বসে থাকে নীরেন কিংবা ছাদে উঠে বসে থাকে অথবা বাথরুমের গবাক্ষে চোখ রেখে দাঁড়িয়ে থাকে আর খুনের মোটিফ পর্যবেক্ষণ করে। বাজার থেকে একটা দূরবীণও কিনে নিয়েছে। আর আমার ছোট্ট টেপরেকর্ডার এবং ক্যামেরাটা সব সময় সাথে সাথে রাখছে। বলা তো যায় না কখন কোন প্রয়োজনে লাগবে। কিন্তু এই তিন দিনে তদন্তের কোনো সুরাহা হয় নি। পুলিশের কানে বিষয়টি যায় নি, এমন ভাবা যায় না। তবে পুলিশের ভূমিকা জড় পদার্থের মতো। নির্লিপ্ত। যেন 'ডুবে যাক তরী, ভেসে যাক মন' এরকম অবস্থা।

তিন ছেলে নিয়ে পিরোজপুর থেকে ইদ্রিসের বউ কুলসুম এসেছে শেষ দেখা দেখতে দিন দুই আগে। নানা রকম পিঠা, ভর্তা, তগড়ি মাছের ঝোল ইত্যাদি নিয়ে এসেছে নিজ হাতে রেঁধে। উৎসবের আমেজ। কাতরকণ্ঠে কুলসুম জিজ্ঞেস করল– ওগো, তুমি কী খাইতে চাও? চিঁ চিঁ করে ইদ্রিস উত্তর দিল– গন্দভ্যাদাইলার বড়া। হায় কপাল! তা পাবে কোথায়? এ যেন কুলসুমের অগ্নিপরীক্ষা। এর চেয়ে বিশল্যকরণী আনতে বললেও ভালো হতো। স্বামীর শেষ ইচ্ছা বলে কথা। কিন্তু সারাদিন খোঁজাখুঁজি করে কোথাও গন্ধভাদালির পাতা পেল না কুলসুম। এ কথা শুনে কোথা থেকে এক তাড়া গন্ধভাদালির লতা-পাতা নিয়ে এসেছে পাখির মা। তা দেখে তেলেবেগুনে জ্বলে উঠল কুলসুম। ছোঁ মেরে নিয়ে এক টানে ছুঁড়ে ফেলে দিল নর্দমায়। 'গতরখাগি, বান্দোশোগি, আমার সোংসারে আগুন লাগাইতে আইছোস্?' পাখির মা যেন সতিন। একবার কুলসুমের দিকে তাকিয়ে ইদ্রিসের দিকে তাকাল পাখির মা। তারপর চলে গেল মথুরা ছেড়ে। ইদ্রিস চোখ নামাল। শুরু হলো রাধার মানভঞ্জন পালা। কাজ হলো না। প্যারেড করতে করতে তিন ছেলের হাত ধরে পিরোজপুর চলে গেল কুলসুম। ইদ্রিস উদাস– 'কা তব কান্তা', ঐ তো কবর দেখা যায়। কবরের দিকে তাকিয়ে ইদ্রিস ভাবুক হয়ে যায়। তাকিয়েই থাকে।

ভোরবেলা নীরেন কলেজের তিন তলার এক রুমে ঢুকে উত্তর পাশের জানালাটা সামান্য একটু ফাঁক করে চোখে দূরবীণ লাগিয়ে বসে থাকে। তাকিয়ে থাকতে থাকতে এক সময় চোখ ঝাপসা হয়ে আসে। ঝাপসা কুয়াশার ভেতর দেখতে পায় কে যেন ধীর পায়ে কবরের দিকে এগুচ্ছে। এদিক ওদিক তাকাচ্ছে। নীরেন নড়াচড়া দিয়ে বসে। চোখ রগড়ে আবার দূরবীণ তাক করে। কোদাল হাতে কবরের দিকে এগিয়ে যায় কলেজের আয়া কানিজ কবিরের ছেলে কাদের। তড়াক করে লাফিয়ে ওঠে নীরেন। কালু শেখ তাহলে একে লাগিয়েছে কবর খোঁড়ার কাজে? কিন্তু গোয়েন্দার ধর্ম হাতেনাতে যুক্তি প্রমাণসহ ধরা। ধৈর্য আর বিচক্ষণতাই গোয়েন্দার মূলধন। তাই সংযত করে নিজেকে। আস্তে করে বেরিয়ে আসে কলেজ ক্যাম্পাস থেকে। গোয়েন্দাদের পিস্তল থাকে। নীরেন শিক্ষক। তাই তার পিস্তল নেই। একা একা যেতে ভয় করতে লাগল। সে বাসায় ফিরে এল। আমাদের ঘুম থেকে তুলে রেডি করে কবরের কাছে নিয়ে যেতে যেতে কাদের উধাও।

এখন কী উপায়? গোলটেবিল বৈঠক। কলেজের শিক্ষক মিলনায়তনে বসে চায়ের অর্ডার দেয়া হলো ইদ্রিসকে। সাথে নোন্‌তা বিস্কুট। কারণ তখনও অন্য কোনো পিওন আসে নি কলেজে। আজ অবশ্য ইদ্রিস 'না' করল না। বরং গরজটা যেন তার একটু বেশিই। যেহেতু তার বিষয় নিয়ে জল্পনা। নীরেন সিগারেট খায় না কখনও। আজ অবশ্য দু'টো বেনসন সিগারেট আনাল। আকাশের দিকে সিগারেটের ধোঁয়া ছেড়ে চায়ের কাপে চুমুক দিল। সামনে সাদা কাগজ আর কলম। চা খেতে খেতে সিদ্ধান্ত হলো কাদেরকে ডাকা হোক এখানে। ইদ্রিস যেতে সাহস পেল না। তাছাড়া নীরেন বলল ইদ্রিসকে দেখলে কাদের সচেতন হয়ে যেতে পারে। তাহলে খুনের মোটিফ চিহ্নিত করা কঠিন হবে। তাই মুনিরকে পাঠানো হলো কাদেরকে ডাকতে। কাদের এল। নীরেনের চোয়াল শক্ত হলো। কাদেরকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে নীরেন দেখছে। গায়ে গেঞ্জি, পরনে লুঙ্গি। পোশাক ঠিক আছে। এ পোশাকেই তাকে দেখা গেছে সকালে। না, হাতে পায়ে মাটি লেগে নেই। ধুয়ে ফেলেছে এরই মধ্যে। বেশ সেয়ানা ঘুঘু। এবার শুরু হলো নীরেনের জেরা–

– কাদের, তুমি কোদাল হাতে কবরের কাছে কখন গেছিলে?
– স্যার, কবরের কাছে? কোন্ কবর? আমি তো কোনো কবরের কাছে যাই নাই?
– বাহ্ বা। কিছুই জানো না? ন্যাকামো করো না। সকালে তুমি কোদাল হাতে যাও নি? তোমার ছবি তুলে রেখেছি। মিথ্যে বলে কোন লাভ হবে না।
– স্যার, সে তো কলেজের পিছনে ওই ক্ষেতে গেছিলাম।
– এই তো মুখ খুলেছো চান্দু? ক্যান গেছিলে?
– কিন্তু ওখানে তো কোনো কবর নাই স্যার?
– আছে, আছে। আস্তে আস্তে সব বেরুবে। এখন বলো তো কী করতে গেছিলে ওখানে?
– স্যার, লাউয়ের চারা লাগাতে।
– বাজে বকো না। যা সত্য তাই বলো। নইলে বিপদ আছে।
– স্যার মিছা কই নাই। লাউয়ের চারা লাগাতে গেছিলাম। বিশ্বাস না হয় গিয়া দ্যাখেন।
– বেশ চলো।

শিশিরে পা ভিজিয়ে কিছুক্ষণের মধ্যে সবাই গিয়ে উপস্থিত কথিত কবরের সামনে। ইদ্রিসও রয়েছে সাথে। ইদ্রিসের তথ্য সত্য। দেড় হাত বাই সাড়ে তিন হাত। দেখি কবরে মাটি চাপা দেয়া। মাটিটা ভিজে আছে। ঝুরঝুরে। তার উপর ফুলগাছের বদলে লাউয়ের চারা লাগানো। ডাগর ডাগর লাউয়ের চারাগুলো বাতাসে দুলছে। শিশু শিশু লাউগাছের সবুজ সবুজ পাতাগুলো আমাদের টা টা দিচ্ছে। এ ওর মুখের দিকে তাকিয়ে আমরা আবার মোনাজাতের ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে থাকলাম ইদ্রিসের কবরের সামনে। ইদ্রিস না মরিয়া প্রমাণ করিল যে সে মরে গেছে। যেন ইদ্রিসের জানাজা।

ইদ্রিসের দিকে তাকিয়ে গাইতে ইচ্ছে হলো– 'তোমার সমাধি' লাউগাছে ঢাকা।

ছাই

এক

অনেক ভেবেচিন্তে অবশেষে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছাল যে, তারা 'ছাই' এর দোকান দেবে। সেই ভালো, পুঁজি কম, মুনাফা বেশি, স্বাধীন ব্যবসা, এ্যাডভান্স নাই, পজেশনের ঝামেলা নাই। তাছাড়া বেকার বলে আর বাপ-দাদার টক-ঝাল-মিষ্টি মেশানো 'ফুস্‌কা-মার্কা' গালি খেতে হবে না। ওসব খেলে বুকতো দূরের কথা, পিত্তিও জ্বলে যায়। বাবার বকুনি খেয়ে একবার বমি করে দিয়েছিল ছালাম। বকুনিতো নয় যেন নিমের পাচন। গৃহপালিত জন্তু যে কয়টা আছে সংসারে এক এক করে তার প্রত্যেকটার নাম প্রয়োগ করে যায় বাবা অনর্গলভাবে সিরিয়ালি এবং সিরিয়াসলি। গরু, ছাগল, কুকুর, বেড়াল, শুয়োর, বাঁদর, গাধা, ঘোড়া, হাতি, ভেড়া মায় ছুঁচো, ইঁদুর, তেলাপোকা, চামচিকে, মাকড়সা পর্যন্ত। তবে খচ্চর বলে কোনোদিন গালি দেয় নি। আশ্চর্য বাবার মুখস্থবিদ্যা এবং স্মরণশক্তি। কেন যে আমলা না হয়ে কামলা হলো তাই বুঝতে পারে না ছালাম। বেকার খেতাবটা এবার কবর দেবে। তাই স্বাধীন ব্যবসা। কেউ জিজ্ঞেস করলেও বলা যাবে– 'বিজনেস করি'।

তারা মানে তারা দু'জন। ছালাম আর ইদ্রিস। মামা-ভাগ্নে। মামা-ভাগ্নে হলে কী হবে– দুজন হরিহর আত্মা। একই মুদ্রার এপিঠ-ওপিঠ। বয়স একই দুজনের। দু'এক মাসের ছোট-বড়। পঁচিশ/ছাব্বিশ বছরের যুবক। দু'জনে খুব ভাব। দুই বন্ধু। কাজে-অকাজে অসম্ভব মিল। একই সাথে দুজনে এস.এস.সি. পাস করল। দুজনই থার্ড ডিভিশন। একই সাথে এইচ.এস.সি. পাস করল। দুজনই থার্ড ডিভিশন। আর পড়ে সময় নষ্ট করা অর্থহীন মনে করে অর্থ উপার্জনের ধান্দায় বের হলো। যা করে, দুজনে একই সাথেই করে। চাকরির চেষ্টাও করল। গার্মেন্টসে ছাড়া হয় না। অসম্ভব খাটুনি সহ্য করতে না পেরে ছেড়ে দিল। কিন্তু নাম জুটল 'খোদার ষাঁড়'। কারণ সারাদিন ঘুরে বেড়ায়। চাকরি তাদের টো টো কোম্পানিতে। রাতে এসে খেয়েদেয়ে একসাথে ঘুমায়।

ঘটে তাদের বিদ্যে বিশেষ নেই, তবে বুদ্ধি আছে ঢের। তারা ভেবে দেখল, এত অল্প বিদ্যায় তেমন কোনো ভালো চাকরি এই বাজারে পাওয়া সম্ভব নয়। সবচেয়ে ভালো হয় দুজন মিলে ব্যবসা করলে। কিন্তু পুঁজি কোথায়? চিন্তা-ভাবনা করে বের করল– 'শেষ বিদায় স্টোর'। ব্যবসায় পুঁজি কম হলেও চলবে। দু'তিনটে বাক্স আর কয়েক গজ কাফনের কাপড় যোগাড় করতে পারলেই হলো। এক সাথে এর বেশি বাক্সের দরকার নেই। কারণ, একই সময়ে সাধারণত দুই/তিনজনের বেশি মানুষ মরে না। ব্যতিক্রম তো থাকতেই পারে। একটা বাক্স বিক্রির টাকায় আর একটা বাক্স তৈরি করে নিলেই হলো। তাই দু'তিনটে বাক্সই যথেষ্ট। অল্প দামে কাঠ আর লোহা কিনে নিজেরাই বাক্স বানাতে পারবে। সেজন্যেও কিছু টাকা লাগবে। দোকানের নাম হবে 'মামা-ভাগ্নে শেষ বিদায় স্টোর'। এ ব্যবসা জমবেই। বাংলাদেশে যে হারে জনসংখ্যা বাড়ছে, তাতে আশার আলো দেখা যাচ্ছে। কারণ মানুষ মরবেই। যত মানুষ, তত মৃত্যু; বলে গেছে . . . নাম মনে পড়ছে না। তাছাড়া বোমা হামলা, গুলী, ভেজাল খাবার, ছাদ ধ্বস, সড়ক দুর্ঘটনা, চিকিৎসার অভাব, ভুল চিকিৎসা, অপহরণ, আত্মহত্যা ইত্যাদি কারণে প্রতিদিন প্রচুর মানুষ মারা যায়। বোমা হামলা আর অপহরণের কেসে অবশ্য লাশের হান্ড্রেড পার্সেন্ট গ্যারান্টি নেই। ফিফটি ফিফটি। কারণ, অপহরণ কেসে অনেক সময় লাশ পাওয়াই যায় না। আর বোমার ক্ষেত্রে মাঝে মাঝে পুরোটাই পুড়ে যায়। অন্যান্য ক্ষেত্রে লাশের নিশ্চয়তা আছে। নিশ্চিত ব্যবসা। লাভজনক। সবাই জানে– 'জন্মিলে মরিতে হবে'। ইদ্রিস বলল– মামা, সাইনবোর্ডে লেখা থাকবে– 'চিরদিন কে রবে ভবে, জন্মিলে মরিতে হবে'। ছালাম বলল– না না। 'আসুন শান্তিতে ঘুমাই' লেখা থাকবে। আর দোকানে সারাদিন ক্যাসেটে গান বাজতে থাকবে– 'জীবনে যদি দ্বীপ জ্বালাতে নাহি পারো, সমাধি পড়ে মোর জেলে দিও'। ব্যস। সিদ্ধান্ত পাকা।

কিন্তু সমস্যা হলো অন্য জায়গায়। বাড়িতে বিষয়টা তুলতেই বাঁশ ফাটার মতো সশব্দে ছালামের বাবা চটে উঠলেন– ওসব করা চলবে না। অন্য যা করো, পান বিড়ি সিগারেটের দোকান দাও, চা বেচো, চানাচুর বেচো– দু'চার-পাঁচশো দেয়া যাবে; কিন্তু ওই শেষ বিদায় ব্যবসায় নয়। বিদায়-ফিদায় বাদ। মুচিগিরি করো, মেথরগিরি করো, রিক্সা চালাও– আপত্তি নাই; মাগার শেষ বিদায় স্টোর চলবে না। টেবিলে ঘুসি মেরে ছালাম বলল– আলবৎ চলবে। কিন্তু বাপ তার ন্যাড়া তালগাছ। এক পায়ে খাড়া। নড়বে না। বলল– ছিনতাই করো, চাক্কু কিন্যা দেবো; সেলুন দেও, ক্ষুর-কাচি কিন্যা দেবো; মাগার লাশের বাক্স না। অসম্ভব। ছালামের 'আলবৎ' চলল না।

আবার চিন্তায় পড়ে গেল মামা-ভাগ্নে। ভাগ্নে ইদ্রিস ভাবছে– এত কম পুঁজিতে কী ব্যবসা করবে? যা-ই করুক, দোকানের নাম দেবে 'মামা-ভাগ্নে' স্টোর। মানে ছালাম-ইদ্রিস স্টোর। হঠাৎ তড়াক করে লাফিয়ে ওঠে ইদ্রিস – 'ইউরেকা, ইউরেকা'।

ছালাম– কী পাইলি ভাইগ্ন্যা?

ইদ্রিস– মামা, তোর নামের ছালামের 'ছা' আর আমার নামের ইদ্রিসের 'ই' মিল্যা কী হয়?

ছালাম– ছা ... ই। মানে ছাই?

ইদ্রিস– হ, পুঁজি কম, মুনাফা বেশি।

স্প্রিং এর মতো ঝটাং করে লাফিয়ে ওঠে ছালাম– ঠিক কইছোস ভাইগ্ন্যা, ছাই ফেলতে ভাঙ্গা কুলা। আমরা হলাম গিয়া ভাঙ্গা কুলা। আমরা ছাইয়ের দোকানই দেবো। দোকানের নাম দেবো 'মামা-ভাগ্নে ছাই কোম্পানি লিমিটেড'। আমি এম.ডি.। আর তুই জি.এম.। দেশে এই একটা জিনিসের কোনো অভাব নাই। দামও কম, চাহিদাও বেশি। কথায় বলে না– যেখানে দেখিবে ছাই, উড়াইয়া দেখো তাই; পাইলেও পাইতে পারো ... কী যেন ... তারপর কী যেন, কস্ না? তারপর আর মনে নাই। তর মনে আছে?

ইদ্রিস– তারপরে মনে হয় আগুন। পাইলেও পাইতে পারো আগুন।

এ প্রস্তাবটাও গ্রহণ করল না তার বাবা। ছালাম নাছোড়বান্দা– 'মুসলমানের এক জবান। 'শেষ বিদায় স্টোর' বাদে যা করব, তাতেই তুমি টাকা দিবা কইছ। এখন জবান ঠিক রাখছ না। তোমার কথার কোনো দাম নাই। তুমি রাজাকার। তুমি আলবদর। তুমি দেশের শত্রু। আমরা আর সিদ্ধান্ত পাল্টাব না। তিন দিনের মধ্যে আমাদের খরচের সব টাকা কড়ায়-গণ্ডায় মিটিয়ে দিতে অবে। আল্টিমেটাম। আজকে জুনের দশ তারিখ। ডেট লাইন আনলাকি থার্টিন। নইলে কঠোর আন্দোলন। মামা-ভাগ্নে দু'জনে একযোগে প্রেস ক্লাবের সামনে আমরণ অনশন ধর্মঘট করব। শেষে আত্মহত্যা। তারপর তোমরা 'শেষ বিদায় স্টোর' এ দৌড়াবা। মোটা টাকা দিয়া বাক্স কিনবা। নিজেদের দোকান থাকলে অবশ্য আর অন্যদের দোকানে দৌড়াদৌড়ি করতে হতো না। বাক্স আর কাফনের কাপড় ফ্রি পাইতে। গুড বাই'। মায়ের কাছে গিয়ে গান ধরল– 'একবার বিদায় দে মা ঘুরে আসি'।

দুই

অবশেষে টাকা মিলল এবং গলির মোড়ে ছোট্ট একটা দোকান খুলে বসল। সাইনবোর্ড ঝুলল– 'মামা-ভাগ্নে ছাই (Ass) কোম্পানি লিঃ'। নিচে ছোট করে লেখা– বিশুদ্ধ 'ছাই' এর একমাত্র নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান। একরঙা কিছু পোস্টার ছাপানো হলো। পোস্টারে কবিতার ঢঙে লেখা হলো– 'ছোট ছোট বস্তা, দামে ভারি সস্তা; বলো কী যে পাই, এক মুঠো ছাই, আর কী চাই'? শহরের রাস্তায় রাস্তায়, দেয়ালে দেয়ালে, স্কুল-কলেজের গেটের সামনে, সিনেমা হলের গেটের সামনে আটার আঠা দিয়ে লাগিয়ে দেয়া হলো পোস্টার। কাঠের তক্তা কিনে র‍্যাক বানানো হলো নিজেদের হাতেই। লাল, নীল, সবুজ, হলুদ, কমলা, বেগুনি নানা রঙে রাঙানো হলো র‍্যাকগুলো। চিকের কাগজ ঝুলিয়ে ঝুলিয়ে সাজানো হলো পুরো দোকান। রঙিন ফিতা কেটে দোকান উদ্বোধন করা হলো এক বিকেলে। উদ্বোধন করলেন এলাকার সবচেয়ে অভিজ্ঞ এবং বয়োভারে ন্যুব্জ প্রবীণা কাজের বুয়া (তার নাম জানা যায় নি, কথিত ছাই দিয়ে থালা-বাসন মাজার সময় তিনি নাকি আজ অব্দি একটাও স্টিলের গেলাস এবং স্টিলের প্লেট ভাঙেন নি; যা দুএকটা কাচের গেলাস এবং কাচের প্লেট ভেঙেছেন) ফুলির মা। উদ্বোধন শেষে তাকে অবশ্য এক প্যাকেট ছাই ফ্রি দেয়া হলো।

একটা টেবিল, দুটো চেয়ার। টেবিলের একপাশে একটা ফুলদানিতে রজনীগন্ধার একটা স্টিক। প্রতিদিনই থাকে। অন্যপাশে একটা টেলিফোন সেট। সংযোগবিহীন। ঢাকা হকি স্টেডিয়ামের পাশের ফুটপাতের দোকান থেকে পঁচাত্তর টাকায় কেনা। নষ্ট। ধুয়ে-মুছে ঝকঝকে, তকতকে। পাশেই একটা বালতিতে এক বালতি জল, একটা মগ, দু'টো ঝকঝকে প্লেট; আর এক প্যাকেট ছাই। ইচ্ছে হলে ক্রেতানিরা (ওরা অবশ্য ক্রেতা বলে না, বিশেষ করে বেশির ভাগ মহিলারাই কিনতে আসে বিধায় ক্রেতানি বলে) আসল না নকল, তা পরীক্ষা করে কিনতে পারবেন। অবশ্য যে ছাই প্যাকেট ওখানে রাখা থাকে, তার মধ্যে আগে থেকেই কিছুটা হুইল পাউডার মিশিয়ে রাখা আছে।
র‍্যাকে থরে থরে প্যাকেটে ছাই। লেখা সাঁটা রয়েছে কাগজে– মাছকাটা ছাই, দাঁতমাজা ছাই, থালা-বাসন মাজা ছাই; নিমের ছাই, তুষের ছাই, আমকাঠের ছাই, ঘসির ছাই; বগুড়ার ছাই, দিনাজপুরের ছাই, নোয়াখালির ছাই, বরিশালের ছাই, শেরপুরের ছাই; শ্মশানের ছাই, কবরের ছাই, বোমায় পোড়া ছাই। দুই পাশে দুটো মোটা কাগজ ঝুলছে। তার একটাতে লেখা– 'একদর'। অন্যটাতে লেখা– 'বাকি চাহিয়া লজ্জা দিবেন না'।

স্বচ্ছ পলি প্যাকেটে থরে থরে সাজানো রয়েছে নানা রঙের ছাই। কোনোটা কুচকুচে কালো, কোনোটা মাঝারি কালো, কোনোটা ধূসর, কোনোটা ফ্যাকাসে, কোনোটা হালকা সাদা। সাইজের দিক থেকে তিন ধরনের প্যাকেট রয়েছে– ২৫০ গ্রাম, ৫০০ গ্রাম এবং ১ কে.জি. ওজনের। যেটা দাঁতমাজার ছাই, সেটায় হাল্কা কর্পূর মেশানো। প্যাকেটের গায়ে সুন্দর করে উৎপাদনের তারিখ এবং মেয়াদ উত্তীর্ণের তারিখ লিখে রাখা হয়েছে। ফিক্সড প্রাইজ। প্রত্যেক প্যাকেটের গায়ে নির্ধারিত মূল্য লেখা রয়েছে। আর লেখা রয়েছে 'নকল হইতে সাবধান'।
'ফেলো কড়ি, মাখো তেল' নীতি। কথা বলার বিশেষ কিছু নেই। দোকানে প্রবেশ করুন। র‍্যাকে চোখ বুলিয়ে বেছে নিন আপনার পছন্দের প্যাকেট। প্যাকেটের গায়ে লেখা দাম টেবিলে ফেলে প্যাকেটটা ব্যাগে পুরে প্রস্থান। এ যেন নির্বাক চলচ্চিত্র। তবে সাদা-কালো নয়, রঙিন। চলচ্চিত্র সবাক কখনও সখনও হয়, যখন কোনো কোনো বাড়ির অশিক্ষিত কাজের মেয়ে আসে। তারা পড়তে পারে না। তাই প্রশ্ন করে। জানতে চায়। জানার তো আর শেষ নাই! আর অনেকে পড়তে পারলেও পড়তে না পারার ভান করে। ওদের দিকে কেমন কেমন তাকিয়ে মিটিমিটি হাসে। অযথা কথা বলে। এটা সেটা জিজ্ঞেস করে। ওদের কান গরম হয়ে ওঠে। ভারি বিরক্তি লাগে। খদ্দের বলে কথা। দুষ্ট খদ্দের। ঠোঁটে গান্ধী মার্কা একখানা হাসি ঝুলিয়ে ওরা মোবাইল ফোনের কাস্টমার কেয়ার সেন্টারের মেয়েদের মতো মিষ্টি মিষ্টি কথা বলে। আর দু'একটা ভুল ইংরেজি ঝাড়ে।
কয়েক দিনের মধ্যেই ব্যবসাটা জমে উঠল। ভালোই হচ্ছে বেচাকেনা। গৃহিণীদের পদচারণাই বেশি। ছেলে-বুড়াও আসে। ছাত্র, শিক্ষক, মস্তান সবাই আসে। মস্তানরা অবশ্য মাঝে-মধ্যেই দু'এক প্যাকেট ছাই 'দাম পরে নিস' বলে বাকি নিয়ে চলে যায়, আর কখনও দাম দেয়ার নাম করে না। কী আর করা? যে দেশের যে নিয়ম। অনেকে এমনি এমনিও আসে দোকানটা দেখতে। কেউ কেউ বেড়াতে এলে বা বাসায় ফেরার মুখে দোকানটার সামনে এসে থমকে দাঁড়িয়ে ভাবে– চানাচুর কিংবা বিস্কুট তো সারা জীবন ধরেই নেয়া হচ্ছে। তা নেয়ার চেয়ে এক প্যাকেট ছাই নিলেই বা মন্দ কী? সেই ভালো। দামেও সস্তা, আবার অভিনব একটা জিনিস নেয়া হবে। তাই বিক্রি ভালোই হতে লাগল। বেশ রমরমা।
মামা-ভাগ্নে এখন পাড়ার আড্ডার আলোচনার মুখ্য বিষয় হয়ে উঠল। বাসে, ট্রেনে, লঞ্চে, হোটেলে, রেস্টুরেন্টে, চায়ের দোকানে, প্রাতঃক্রিয়ায়, প্রাতঃভ্রমণে লোকের মুখে মুখে ওদের নাম। লোকে বলাবলি করতে লাগল– কেউ কখনও ভেবেছে, ছাইয়ের দোকান দেয়া যায়? ব্যবসা জানা থাকলে কী না করা যায়? ওরাই পথ দেখাল। পাইওনিয়ার। পথপ্রদর্শক। ওরা দেশের 'গর্ভ'। ওদের সংবর্ধনা দেয়া উচিত। লোকাল 'হাটে হাড়ি ভাঙ্গা' পত্রিকায় তাদের নিয়ে একটা রিপোর্টও করে বসল– 'ছাই ফেলতে ভাঙ্গা কুলা' শিরোনামে। মফস্বল শহর; তাই তাদের কথা প্রকাশিত এবং প্রচারিত হতে দেরি লাগল না। তারা এখন টক অব দ্য টাউন। কেউ কেউ বলে ঠক অব দা টাউন।

সময় সম্বন্ধে তারা খুব সচেতন। পাংচুয়াল যাকে বলে। সকাল ন'টা হতে রাত ন'টা পর্যন্ত সার্বক্ষণিক খোলা। ঘড়ির টাইম দেখে খোলে, ঘড়ির টাইম দেখে বন্ধ করে। কাঁটায় কাঁটায়। শুক্রবার বন্ধ। দোকান খুলেই ঝাট দিয়ে গোলাপ জলের ছিটা দিয়ে একটা আগরবাতি জ্বালে। আর রজনীগন্ধার একটা স্টিক দেয় ফুলদানিতে। তারপর দু'জনে দু'টো চেয়ার পেতে বসে ফুলবাবু হয়ে। শার্ট ইন করে প্যান্ট পরা। লাইফ ইনস্যুরেন্স কোম্পানির এজেন্টের মতো টাই পরা। সস্তায় কিনে নিয়েছে। খবরের কাগজও একটা থাকে টেবিলে। পুরনো। কোথাও থেকে জোগাড় করে নেয়। ছাইয়ের ব্যবসা জাঁকজমকপূর্ণ। বিক্রি যা-ই হোক।

তিন

মাস ঘুরতে না ঘুরতেই বিনামেঘে বজ্রপাত। একদিন সন্ধের পরে তাদের 'মামা-ভাগ্নে ছাই কোম্পানি লিঃ' এর সামনে এসে প্রবল গর্জন করে এবং একরাশ ধোঁয়া ছেড়ে থামল একটা মস্ত পুলিশ ভ্যান। ভারী বুটের ঠক্ঠক্ শব্দ তুলে ক'জন পুলিশ নেমে এল গাড়ি থেকে। তাই দেখে মামা– 'ভাইগ্না্যা, দেখছোস; পুলিশও খবর পাইয়া গ্যাছে। পুলিশেরও তো ছাই দরকার? তাই না? তারাও তো দাঁত মাজে, মাছ কাটে? না কী বলিস?'

ভাগ্নে– পুলিশ ছার, পুলিশ ছার, আইসেন; কী সুভাইগ্যো আমাগো। গরিবের দুয়ারে হাতির পারা।

মামা– হাতি কী রে, ছাগল? ছারেগো হাতি কইলে অপমান করা হয় না? বলবি, গরিবের দুয়ারে ঠোলার পারা। পুলিশের বাংলা হইল গিয়া ঠোলা। ছার বলেন, কী ছাই লাগবে?

দলপতি পুলিশ বাঁ পা-টা চেয়ারের উপর তুলে হাতের রুলটা টেবিলে ঠুকে– সব ছাই চাই। সব।

মামা– বলেন কী ছার, সব নেবেন? তাইলে পাইকারি রেটে পাবেন। ছার এজেন্ট খুলছেন নাকি? নাকি বিদেশে ইমপোর্ট করবেন? বিদেশেও হুনছি ছাইয়ের খুব চাহিদা।

ভাগ্নে– ছার, মন্ত্রিদের বাসায়ও এ ছাই প্রেজেন্ট করতে পারেন। ওনারা খুব খুশি হবেন, ছার। ছাই দিয়ে তারা দাঁত না মাজুক; মাগার মাছ তো কাটেন। সোরি, মাছ তো মন্ত্রীরা কাটেন না, কাটেন তাদের কাজের বেটিরা। মানে মাছ তো কাটা হয় ছাই দিয়ে? তা যে মাছই হউক। ইলিশ মাছ বাদে। এমন কোন্ বাসা আছে যে ছাই লাগে না? ছাই এমন একটা জিনিস যা সব বাসায়ই লাগে, সব বাসায়ই আছে, সব বাসায়ই লাগবে। ছাই হতিছে গিয়া কাসুন্দির মতো, সব কিছুতেই . . .

– চোপ্। এই, এ দুডিয়াকে হাতকড়া পরাও। আর সব পদের দুই প্যাকেট কইরে ছাই নিয়ে নেও।

– ছার, এই সবের মানে কী? ছাই দুই প্যাকেট, নইলে চাইর প্যাকেট কইর‌্যা নেন, হাতকড়া ক্যান?

– শ্বশুরবাড়ি যাতি হবে না?

– পুলিশ ছার, মশ্‌করা করেন? শরম লাগে। আমরা তো এখনও বিয়াই করি নাই।

– সেই জন্যিই তো হাতকড়া। শ্বশুরবাড়ি যাবার টেস্ট। ডুবে ডুবে জল খাও। ছাই এর ব্যবসা কইর‌্যা রাতারাতি বড়লোক। বেশ রমরমাই চলতিছে ব্যবসা, তাই না? সব পরিপাটি! উপার দিয়া ফিটফাট, তল দিয়া সদরঘাট; ফোনও আছে; প্যান্ট-টাই; ব্যাপারটা কী হ্যাঁ।

– ছার, স্ট্যাটাস . . . এই জন্যেই . . .

– চোপ্, আমাগে কাছে গোয়েন্দা রিপোর্ট আছে। ডি.বি. পুলিশ অনেকদিন যাবৎ তোমাগের উপর নজর রাখতিছে। টিকটিকি চেনো, টিকটিকি? চলো চলো , শ্বশুরবাড়ি চলো।

– ছার, আমরা কী করছি? ভুল অইলে মাফ কইরা দ্যান। আমরা একেতে গরিব মানুষ, তার উপর হাতের ল্যাখা খারাপ। মাফ কইরা দ্যান ছার।

বেল সদৃশ মাথার চান্দিটা চুলকাতে চুলকাতে বলেন– সেটা এখনও স্পষ্ট না। হিরোইনের ব্যবসাও হতি পারে, আবার বিস্ফোরক দ্রব্যের কারবারও হতি পারে। আমাগের কাছে জেনুইন খবর আছে। তোমরা এক ভয়ঙ্কর কাণ্ড করতিছো। তবে কাণ্ডটা যে কী, তা এখনও পরিষ্কার না। রুলের গুঁতো মারলিই বেরুবেনে। এই, ছাইগুলো সন্দেহজনক। সাবধানে ছাইগুলো নিও। এগুলো ভারি বিপজ্জনক। বিস্ফোরণ না ঘটে যেন। বলা তো যায় না। বিয়ে করিছি মাত্র তিন মাস। স্ত্রীর মুখটা মনে পড়ে। সাবধান!

এরপর মামা-ভাগ্নে তিন দিনের রিমান্ডে। কিন্তু কোন তথ্য বেরুল না। পত্রিকায় খবর বেরুল। সব পত্রিকার প্রথম পাতায় নানাভাবে খবরটা প্রকাশিত হলো। পাশাপাশি মামা-ভাগ্নের ছবি। খবরের শিরোনাম– 'বিস্ফোরক দ্রব্যসহ দুই যুবক আটক', 'ছাই এর প্যাকেটে বারুদ', 'ছাই এর প্যাকেটে হিরোইন', 'ছাইয়ের ভেতর আগুন', 'বিস্ফোরক এবং রহস্যময় দুই যুবক', 'ছাই চাপা আগুন', 'ছাই রহস্য' ইত্যাদি ইত্যাদি। পত্রিকা বিক্রি বেড়ে গেছে এসময়।
পুলিশবাদী কেস। ডিটেনশন। বিস্ফোরক দ্রব্য সংরক্ষণ এবং সরবরাহ। ধারা নম্বর : বিস্ফোরক দ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন ৩ ও ৪। হিরোইন সন্দেহে আর একটা কেস হয়েছে। মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন ১৯ (১) (ক) ও (খ)। পুলিশ সন্দেহ করছে– এটা এ চুনোপুঁটি দু'টোর কাজ নয়। এর পেছনে কোনো রাঘব বোয়াল রয়েছে নিশ্চই। কোনো সন্ত্রাসী দল বা জঙ্গি গোষ্ঠি বা অশুভ চক্র বা বিদেশি কোনো গোয়েন্দা সংস্থা। পুলিশ আদালতের কাছে তাই বারবার রিমান্ড করছে ডিমান্ড।

চার

ছালামের মা সালেহা খাতুন বিছানায়। এখন আর ভাত খায় না, মূর্ছা খায়। ক্ষণেক কান্দে, ক্ষণেক মূর্ছা খায়। চেতন ফিরলেই কপাল চাপড়ায়। চার/পাঁচটা মেয়ের পর একটা মাত্র ছেলে। অনেক ব্যবধানে। আদরের ধন হীরামাণিক। তার স্বামীর ওপর তার যত ক্ষোভ–
– তহোন যদি ট্যাহাটা দিতা, যহোন অরা শ্যাষ বিদায় স্টোর দোকান খোলতে চাইছিল, তাইলে আইজ আমার কপালডা এ্যামন কইর‍্যা ফাটত না।
– তহোন কি আর জানতাম এই ঘটবে। তাইলে তো শ্যাষ বিদায় স্টোরই খুইল্যা দিতাম।
– অহোন শ্যাষ বিদায় স্টোর থিক্যা আমার জইন্যে এট্টা বাক্স নিয়া আইস। আমি তার মইদ্যে শুইয়া চিরনিদ্রা যাই।
'মামা-ভাগ্নে ছাই কোম্পানি' লক আউট। ইয়া বড় এক সরকারি তালা ঝুলছে। সিলগালা দিয়ে আটকানো। সার্বক্ষণিক পাহারা বসানো হয়েছে। সব সময় চারজন করে পুলিশ প্রহরারত। হঠাৎ হঠাৎ কোনো হোমরাচোমরা ব্যক্তি এসে পড়েন। পত্রিকা এবং টিভি সাংবাদিকরা তো মাছির মতো ভন্‌ভন্‌ করছে যেন ওখানে কেউ আমের আঁটি ও খোসা, কাঁঠালের ভুঁতি ফেলে রেখে গেছে। তারপর কখনও ডি.সি. কখনও এস.পি. আসছেন। সেদিন জেলার দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রী এসেও ঘুরে গেলেন। সাথে টি.ভি. ক্যামেরা। নানা আঙ্গিকে এবং নানা ভঙ্গিতে পোজ দিলেন। তিনি বললেন– আমরা আগাম খবর পেয়েছি, আমাদের কাছে গোয়েন্দা রিপোর্ট আছে; দেশব্যাপী বড় ধরনের একটা হামলার পরিকল্পনা করছে এরা। উই আর লুকিং ফর সন্ত্রাসী এন্ড ফাইন্ড আউট দেম ইডিয়েটলি, সরি, ইমিডিয়েটলি। উই আর লুকিং এ্যাবাউট দিস বোমাবাজ, ইনশাল্লাহ্‌হ্‌হ্‌হ্‌ আমরা সাকসেস ফুল হবোই ভেরি সুন।
ভিড় দেখে এবং কাণ্ডকারখানা দেখে এক রিক্সাযাত্রী তরুণ রিক্সাওয়ালাকে জিজ্ঞেস করলেন–
– ভাই, এখানে কী হচ্ছে?
– মনে অয় শ্যুটিং অইতাছে। খাড়ান ফাঁক ফোকর দিয়া আমি নায়িকারে এট্টু দেইখ্যা আহি। বলেই রিক্সাটা থামিয়ে লাফ দিয়ে নেমে, ভিড়ের কাছে গেল। কিছুক্ষণ বাদে ফিরে এসে বলল–
– শ্যুটিং অইতাছে। নায়িকা নাই, নায়কও আহে নাই। ভিলেন মনে হয়। ভিলেনরে দেখলাম। চহে কালো সানগ্লাস পরা। হালারপুতের চুলগুলান খাড়া খাড়া। সজারুর মতোন।
– কী বইয়ের শ্যুটিং ভাই?
– কী ছাইয়া ছাইয়া . . . না কী জানি কইল। হিরোইনরেও এট্টু দেখবার পাইলাম না। তয় হিরোইনের কতা হুনলাম। বইডা দেখতি অবে ঢাকা অভিসার হলে গিয়া। ছাইয়া, ছাইয়া, ছাইয়া; চল ছাইয়া, ছাইয়া, ছাইয়া– গাইতে গাইতে রিক্সা চালক প্যাডেলে তার আনন্দ ঢেলে চলতে লাগল।

পাঁচ

তিন সদস্য-বিশিষ্ট তদন্ত কমিটি গঠন করা হলো। নাম দেয়া হলো AIC (Ash Investigation Commitee)। পরীক্ষার জন্য কিছু ছাই পাঠানো হলো স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের ল্যাবে। এর মধ্যে হিরোইন, কোকেন বা অন্য কোনো মাদক দ্রব্য রয়েছে কি না। কিছু ছাই পাঠানো হলো আর্মি হেড কোয়ার্টারে। শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত ল্যাবের মধ্যে বসেও ঘেমে উঠলেন বিশেষজ্ঞরা; কিন্তু কোনো কিনার করতে পারলেন না। তাঁরা তাঁদের রিপোর্ট বই আকারে প্রকাশ করলেন। রিপোর্টের প্রকাশনা উৎসব হলো। মন্ত্রী এলেন। টি.ভি.তে খবর প্রকাশিত হলো। আবার বাতাসে ছাই উড়ল। সারা দেশের আকাশে বাতাসে শুধু ছাই আর ছাই। কিন্তু চিরকেলে সেই প্রবাদ– 'যেখানে দেখিবে ছাই, উড়াইয়া দেখো তাই; পাইলেও পাইতে পারো মানিক রতন' মিথ্যে হয়ে গেল। ছাই উড়ল, কিন্তু ছাইয়ের মধ্যে কিছুই পাওয়া গেল না। কিন্তু বিশেষজ্ঞ এবং তদন্ত কমিটি হাল ছাড়লেন না। তারা এ প্রবাদটিও জানেন যে– 'একবার না পারিলে দেখ শতবার'। মাত্র একবার তাদের চেষ্টা বিফল হলো। আরও ৯৯ বার রয়েছে। নেপোলিয়ান বোনাপার্টের কথাও তারা শুনেছেন। তিনি একটা মাকড়সার কাছ থেকে বারবার চেষ্টায় যে সাফল্য আসে, তা শিখেছিলেন। তাই হতোদ্যম না হয়ে পূর্ণোদ্যমে আবার ছাই নিয়ে চলল পরীক্ষা-নিরীক্ষা। আর চলল মাঝে মাঝে মাকড়সা, টিকটিকি, তেলাপোকা দেখা; যদি তাদের কাছ থেকে নেপোলিয়ানের মতো কিছু শেখা যায়। বিশ্বজোড়া পাঠশালা মোর, সবার আমি ছাত্র। মাকড়সা, টিকটিকি, তেলাপোকার ছাত্র হতে আর দোষ কী? শেখার তো কোনো বয়স নেই? সেদিন একটা টিকটিকি এগারবার চেষ্টা করে একটা পোকাকে ঘায়েল করে। অধ্যাবসায়ের শিক্ষা পাওয়া গেল।

কিছু ছাই পরীক্ষার জন্যে পাঠানো হলো ইন্টারপোলের সদর দপ্তরে। কিছু ছাই পাঠানো হলো F.B.I. এর কাছে। তিন সদস্য বিশিষ্ট ছাই তদন্ত কমিটি ফেল। তারা গলদঘর্ম। তাই নতুন করে গঠন করা হলো 'ছাই কমিশন'। তদন্ত কমিটির প্রধানকে চেয়ারম্যান করে গঠন করা হলো 'ছাই কমিশন'। পুরো একটা তিনতলা বাড়ি ভাড়া করে দপ্তর খোলা হলো। দেড় টনের গোটা কয়েক এ.সি. লাগানো হলো। গেটে পুলিশ মোতায়েন করা হলো। একটা রাসায়নিক পরীক্ষাগার তৈরি হলো। মাইক্রোস্কোপ, আসবাবপত্র এবং গাড়ি কেনার জন্য একটি ক্রয় কমিটি গঠন করা হলো। ক্রয় কমিটির অফিসের জন্য আর একটা বাড়ি ভাড়া করা হলো। গোটা কয়েক শক্তিশালী মাইক্রোস্কোপ কেনা হলো। তদন্ত প্রক্রিয়ার কোনো কমতি নেই। আয়োজন বেশ জাঁকজমকপূর্ণভাবেই চলতে লাগল।

চলচ্চিত্র পরিচালক হিম্মত আলির হিম্মত আছে বলতে হবে। তিনি স্থির করলেন 'ছাই' নিয়ে একটা সাম্প্রতিক বিষয়ের ছবি বানাবেন। ছবির নাম দেবেন– 'ছাই কেন জেলে'? এটা হবে একটা ডকুমেন্টারি ফিল্ম। সিম্বলিক ছবি। তিনি দাবি করছেন– ছাই নিয়ে পৃথিবীতে এখন পর্যন্ত কেউ কোনো ছবি বানায় নি। তিনিই প্রথম গৌরবের দাবিদার। গিনেস বুক অব ওয়ার্ল্ডে নাম ওঠানোর কথা ভাবছেন তিনি। ছবিটা বানানোর জন্য ইতোমধ্যে পড়ালেখা এবং ছাই নিয়ে গবেষণা শুরু করে দিয়েছেন। দুঃখের বিষয়– ছাই নিয়ে লেখা তেমন কোনো বই তিনি খুঁজে পেলেন না। মনের খেদে বাংলা সাহিত্য এবং বাংলার গবেষকদের গুষ্টির পিণ্ডি চটকালেন। তিনি মনে করেন পাঠ্যসূচিতে 'ছাই' অন্তর্ভুক্ত করা উচিত। তাহলে ছাত্র-ছাত্রীরা ছাই সম্বন্ধে জানতে পারবে এবং বই-পত্রও লেখা হবে। এমনকি বিশ্ববিদ্যালয়ে 'ছাই' ডিপার্টমেন্টও খোলা উচিত। অবশ্য ইতোমধ্যে তিনি স্ক্রিপ্ট লেখার কাজ শুরু করে দিয়েছেন।

জেলের সেলে বন্দি ছালাম আর ইদ্রিস। সংক্ষেপে 'ছাই'। দুজনকে এক সাথে না রেখে পাশাপাশি আলাদা আলাদা সেলে রাখা হয়েছে। ছবিটার শুরু মুজিব পরদেশির 'আমি বন্দি কারাগারে মা' গানটার মধ্য দিয়ে। লং শটে দূর থেকে পাশাপাশি দুটো সেলের গ্রিল দেখা যাবে। ক্রমশ ক্লোজ হতে হতে বড় হয়ে কিছুক্ষণ স্থির থাকবে। দুই গ্রিলের ফাঁকে ক্লোজ শটে দেখা যাবে ছালাম আর ইদ্রিসের দুটো মুখ। বিষণ্ন। করুণ। তারপর বড় বড় লাল অক্ষরে লেখা উঠবে স্ক্রিনে– 'ছাই কেন জেলে'? ইতোমধ্যে তথ্য ও সংস্কৃতি মন্ত্রণালয় এবং স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের অনুমতি মিলেছে 'ছাই' নিয়ে ডকুমেন্টারি বানানোর। তাই ক্যামেরা, সেট, লাইট, সব নিয়ে হিম্মত আলি জেলে চলে আসেন। তাদের সাথে কথা বলেন। শ্যুটিং করেন। কিন্তু জেলের বাইরে তাদের যেতে দিচ্ছে না বলে আউটডোর শ্যুটিং হচ্ছে না। মামা-ভাগ্নেকে কারাগারের বাইরে নিতে কারা কর্তৃপক্ষের অনুমতি মিলছে না। ছবির কাজও তাই এগুচ্ছে না।

দুই সেলে দু'জন রাখার কারণ দু'জনে যাতে গোপন কোনো শলাপরামর্শ করতে না পারে। তাদের উপর নজর রাখার জন্য ক্লোজ সার্কিট ক্যামেরা বসানো হয়েছে। সেদিন ছালামকে আগে রিমান্ডে নিল। কোনো তথ্য মিলল না।
পুলিশ– সত্যি করে বল্, ও তে কী আছে?
ছালাম– ছাই আছে।
সাথে সাথে রুলের গুঁতো। ছালাম চেঁচিয়ে বলে– হিরোইন।
পুলিশ– এইতো চান্দু, মুখ খুলেছে। বল্, তোর পেছনে কে আছে; মাফিয়া না কোনো জঙ্গি সংগঠন?
– জঙ্গি সংগঠন।
এরপর ইদ্রিসের রিমান্ডের পালা।
– বল, এতে কী আছে?
– ছার, ছাই আছে।
– সাথে সাথে পোঁদে লাথি। বল্, সত্যি করে বল্–
– ছার, বারুদ আছে; বোমা বানানোর বারুদ।
– তোদের পেছনে কে আছে? কোনো জঙ্গি সংগঠন, না মাফিয়া।
– ছার, মাফিয়া।
ব্যস। কেচে গেল। গেল সব গোলমাল হয়ে। গেঁরো কাকে বলে? কোনোভাবেই দু'জনের বক্তব্য একরকম হচ্ছে না। ওদিকে F.B.I. এবং ইন্টারপোলের কর্মকর্তাবৃন্দ কয়েক দফা এসে তদন্ত সেরে গেল, কিছুই পেল না। পরীক্ষাগারে কিছুই ধরা না পড়ায় তারা আরও বেশি নিশ্চিত হলো যে এর মধ্যে মারাত্মক কোনো বিস্ফোরক দ্রব্য আছে। তা এতই শক্তিশালী ও মারাত্মক এবং তার মধ্যে এমন কোনো রাসায়নিক মিশ্রিত আছে যে মেটাল ডিটেক্টর ধরতে পারছে না। সমস্ত যন্ত্র ফেল। তাদের ধারণা, এটা কোনো বিদেশি গোয়েন্দা সংস্থারই কাজ।

ছয়

মুক্তবাজার অর্থনীতি বলে কথা, বিশ্ববাজারে এই ছাই তাই নিলামে উঠল। বিভিন্ন দেশের ছাইপ্রেমীরা F.B.I.সদর দপ্তরে উপস্থিত হয়ে নিলাম ডাকল। কোটি কোটি ডলার ডাক উঠল এক প্যাকেট ছাইয়ের। আমেরিকা থেকে স্পেশাল প্লেন এল ওই দোকানের যাবতীয় ছাই সংগ্রহের জন্য। বাংলাদেশি ছাই বিক্রি করে কোটি কোটি ডলার হাতিয়ে নিল আমেরিকা। এই সুযোগে বাংলাদেশও কোটি কোটি ডলার বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করে ফেলল ছাই বিক্রি করে। অনেকে নিজের ঘরে আগুন দিয়ে বস্তা বস্তা ছাই বিক্রি করছে বাজারে। বাংলাদেশে কাঠের ঘর আর খড়ের ঘরই বেশি বলে ঘর পোড়ানো সহজ। তাই ছাইও বেশি উৎপাদিত হচ্ছে। বিদেশিদের মনে খুব কষ্ট, তাদের দেশের বেশির ভাগই বিল্ডিং। ফলে তা আগুন দিয়ে পোড়ানো যাচ্ছে না এবং ছাইও পাওয়া যাচ্ছে না। এতে করে বেশি বৈদেশিক মুদ্রাও অর্জন করতে ব্যর্থ হচ্ছে তারা। ছাই বিক্রিতে বর্তমানে বাংলাদেশ শীর্ষে। দুর্নীতিতে পরপর পাঁচবার শীর্ষে ছিল বাংলাদেশ। ধারণা করা হচ্ছে ছাই বিক্রিতে ডবল হ্যাট্রিক করতে পারবে। তাহলে বিশ্বের বুকে ইতিহাস সৃষ্টি করবে বাংলাদেশ। এটাই বিশেষাজ্ঞদের মতামত। 'দ্য গার্ডিয়ান' পত্রিকায় এ বিষয়ে জরিপ চালিয়ে একটা ফিচার ছেপেছে।
কতক অসাধু ব্যবসায়ী ছাইয়ের মধ্যে আটা কিংবা গুঁড়ো দুধের ভেজাল মিশিয়ে মোটা টাকা কামাই করে নিয়েছে এই সুযোগে। তা যত কোটি টাকা দামই হোক প্রতি প্যাকেট ছাইয়ের, সব ছাই তো আর বিক্রি করা যায় না। বাংলাদেশের সম্পদ বলে কথা। এটা আমাদের দেশের ঐতিহ্য। সংস্কৃতির অঙ্গ এবং অংশ। তাই এক প্যাকেট ছাই গোপনে রেখে দেয়া হলো জাদুঘরে সংরক্ষণের জন্য। ভবিষ্যৎ প্রজন্ম তা দেখে তাদের জ্ঞানের পরিধি বাড়াতে পারবে। আর বাংলাদেশ যে কত সমৃদ্ধ সে বিষয়ে পরীক্ষার খাতায় বড় বড় প্রবন্ধ রচনা করতে পারবে মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীরা। তাছাড়া এ ছাই প্রত্নতাত্ত্বিকদের গবেষণায়ও কাজে লাগবে। তাই এক প্যাকেট ছাই জাদুঘরে সংরক্ষণের জন্য অতি গোপনে রেখে দেয়া হলো রাষ্ট্রীয় উদ্যোগে।

এই সব ডামাডোলে ছালাম আর ইদ্রিসের তদন্ত প্রক্রিয়া এবং শাস্তিবিধান ছাই চাপা পড়ে গেল। আকাশে-বাতাসে শুধু ছাই। এক বিখ্যাত শিল্পী 'ছাই' নাম দিয়ে একটা ক্যাসেট বাজারে ছাড়ল। সুপার হিট। এমন কোনো কবি নেই যে ছাই নিয়ে কবিতা লেখেন নি। কোনো কোনো দৈনিক 'ছাই' নিয়ে বিশেষ সংখ্যা বের করল। কোনো কবি ছাইয়ের প্রশংসা করে কবিতা লিখলেন। কোনো কবি ছাইকে নিন্দা করে, গালমন্দ করে কবিতা লিখলেন– ছাই, তুই কুলটা, লক্ষ্মী ছাড়া, তুই সর্বনাশা। তোর জন্যই আজ আমাদের কাঁদা আর হাসা। তুই এখন সবাইকে ফাঁসা।
একজনে লিখলেন– তুমি আমার সকালের ছাই, তুমি আমার দুপুরের ছাই, তুমি আমার রাত্রের ছাই, তোমাকেই যেন সদা কাছে পাই। ছাই সোনা, তুমি আমার স্বপ্নেবোনা মিহিদানা, সমুদ্রের নোনা।
কবি সারমেয় সারথি লিখলেন– ছাই তুমি, আমার জীবনের এক মুঠো কবিতা, বিষাদের গান; ছাই তুমি মাছ কাটতে কোমল কিশোরীর প্রাণ, ছাই তুমি দাঁত মাজতে কর্পূরের ঘ্রাণ।
কবি হিল্লোল কল্লোল লিখলেন– ছাই তুমি কার? ওইখানে যেও নাকো, তার প্রেম আজ ছাই হয়।
গীতিকার খিলখিল খন্দকার গান লিখলেন– ধন-ধান্য-ছাইয়ে ভরা, আমাদের এই বসুন্ধরা, ইত্যাদি ইত্যাদি।

ছাইয়ের তলে ছাই চাপা পড়ে গেল ছাইয়ের কথা। ছালাম-আর ইদ্রিস পড়ে রইল জেলে। ছাই নিয়ে এখন সংগীত, ছাই নিয়ে সাহিত্য, ছাই নিয়ে ছবি, ছাই নিয়ে ছায়াছবি, নাটক, সভা, সমাবেশ, সেমিনার পর্যন্ত। এমনকি ছেলেমেয়েদের নামকরণ করার হিড়িক পড়ে গেল ছাই দিয়ে। শোনা যাচ্ছে টেক্সট বুক বোর্ড নাকি 'ছাই' বিষয়ে একটা প্রবন্ধ কলেজের পাঠ্যসূচিতে অন্তর্ভুক্ত করার কথা ভাবছে। কিন্তু সমস্যা দেখা দিয়েছে লেখক নির্বাচন নিয়ে। কে লিখবেন? কাকে দিয়ে লেখাবেন এ বিষয়ে প্রবন্ধ? 'ছাই' বিষয়ে তেমন বিশেষজ্ঞ বর্তমানে কে আছেন বাংলাদেশে? খোঁজ নিয়ে জানা গেল একমাত্র লেখক সন্তোষ ঢালীরই 'ছাই' বিষয়ে মোটামুটি ব্যুৎপত্তি আছে। অতএব তাকেই 'ছাই' বিষয়ে প্রবন্ধ রচনার দায়িত্ব দেয়া যেতে পারে বলে মনে করছেন বিশেষাজ্ঞরা। এ বিষয়ে গবেষণা করার জন্য তাকে ডেপুটেশনে নিয়োগ দেয়া হয়েছে মোটা টাকা মাইনে দিয়ে।
একদিন সকালবেলা কয়েকটা দৈনিকের হেড লাইনে খবর উঠল– 'ছাই উড়ে গেছে'। জাদুঘরে সংরক্ষণের জন্য যে ছাইয়ের প্যাকেট রাখা হয়েছিল, তা লাপাত্তা। ঢাকা শহরে জরুরি অবস্থা ঘোষণা করা হয়েছে। চারদিকে সর্বোচ্চ সতর্কাবস্থা। রেড অ্যালার্ট। বিমান বন্দরে নিশ্ছিদ্র নিরাপত্তা। ছাই যেন বিদেশে পাচার হয়ে যেতে না পারে। 'গিমে' যাদুঘরে প্রত্ন সম্পদ পাচার হয়ে গেছে বলে ছাইও পাচার হয়ে যাবে, তা তো হতে পারে না। যে কোনো মূল্যে তা প্রতিহত করা হবে। গঠন করা হয়েছে 'জাতীয় ছাই রক্ষা কমিটি'। রেল স্টেশনে, প্রতিটা বাসস্ট্যান্ড এবং লঞ্চ টার্মিনালে সমস্ত যাত্রীদের ব্যাগে ছাই তল্লাশি চালনা করা হচ্ছে মেটাল ডিটেক্টর দিয়ে। আর্মি নামানো হয়েছে রাস্তায়। যেন সিপাহী বিদ্রোহ। গোখরো, ভাল্লুক, উদ্‌বিড়াল, খাটাশ, উল্লুক বিভিন্ন নামে দশটি সেনাদল নামানো হয়েছে দশদিক সামলানোর জন্য। যাত্রী-কুলি-বাদামবিক্রেতা মারা যাচ্ছে ক্রসফায়ারে। কয়েক দিন আগে একটা বেওয়ারিশ কুকুর মারা পড়েছে উদ্‌বিড়ালের সাথে ক্রসফায়ারে। যে সমস্ত মহিলা পাড়ায় পাড়ায় মাথায় বস্তা নিয়ে ছাই বিক্রি করতে আসত ফেরি করে, তারা আর আসে না এখন হয়রানি আর ক্রসফায়ারের ভয়ে।
বাংলার আকাশে-বাতাসে ছাই ছাড়া অন্য কোনো কথা নেই এখন আর। কোনো কোনো সাধু বা ফকির 'ছাইবাবা' সেজে বসেছে। পত্রিকায় ১০০% গ্যারান্টি দিয়ে 'মুস্কিল আশান' বিজ্ঞাপন ছাপছে। বর্তমানে ক্যান্সারের চিকিৎসায় ছাইয়ের ব্যবহার নাকি নতুন দিগন্ত উন্মোচন করেছে। ডা. হেজিপেজি খান নাকি ছাই থেরাপির মাধ্যমে সাফল্যের সাথে থেলাস্‌মিয়া, ক্যান্সার, ব্রেইন টিউমার, যক্ষা, হৃদরোগ, ডায়াবেটিস, হেপাটাইটিস এ, বি, সি, ডি, ই, এফ, জি, এইচ, আই, জে, কে, এল ভাইরাসসহ অতি জটিল ও কঠিন রোগের চিকিৎসা করে থাকেন তার 'দি গ্রেট ছাইকিয়াটিক হসপিটাল'এ। দিনরাত ছাব্বিশ ঘণ্টা খোলা। শুক্রবার বন্ধ। নতুন একটা রাজনৈতিক দল গঠন করা হয়েছে 'আল ছাই কায়েদা' নামে। ইতোমধ্যে তারা রাজপথে ছালাম এবং ইদ্রিসের মুক্তির জন্য বেশ কয়েকটা গণমিছিল শেষে জনসভাও করেছে। পত্রিকায় বিবৃতি দিয়েছে। সাংবাদিক সম্মেলনও করেছে একাধিকবার। তাদের জোর দাবি– বাংলাদেশের নাম পরিবর্তন

করে ‘ছাইবাংলা’ করা হোক। জাতীয় পতাকার রঙ লাল-সবুজের বদলে লাল-ছাই করা হোক এবং জাতীয় সংগীতের কিছু কিছু পঙ্ক্তি পরিবর্তন করে ‘রিমেক’ করা হোক। যেমন– ‘আমার ছাইবাংলা, আমি তোমায় ভালোবাসি’ ইত্যাদি।

এদিকে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ও হিমশিম খাচ্ছে পরিস্থিতি সামাল দিতে। দেশে ছাই-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির যথেষ্ট অবনতি ঘটেছে বলে মনে করছেন ইয়োরোপীয় ইউনিয়ন। আই.এম.এফ. ও বিশ্বব্যাঙ্ক চাপ দিচ্ছে সব ছাই তাদের সরবরাহ করার জন্য। নইলে সাহায্য বন্ধের হুমকি দিয়েছে। ছাই-পররাষ্ট্রনীতি সংশোধনের দাবি জানিয়েছে তারা। ছাইবেশবাদী আন্দোলন এবং ছাইয়াধিকারবাদী আন্দোলনও তীব্র হচ্ছে দেশে। সরকারের টালমাতাল অবস্থা। বিরোধীদল সরকার পতনের আন্দোলনের হুমকি দিচ্ছে ছাই পরিস্থির জন্যে। তাদের দাবি, ভারত সরকার ছাই দিয়ে টিপাইমুখ বাঁধ দেয়ারও নাকি পরিকল্পনা করছে এই সরকারের মদদে। সার্বিক পরিস্থিতি যথেষ্ট উত্তপ্ত এবং উদ্বেগজনক।

সাত

এদিকে জেলখানায় বহুজনের বহু ব্যবহৃত পুরনো ব্লেড সাপ্লাই দেয় বলে দাড়ি ঠিক মতো কাটে না। এ কারণে ছালাম এবং ইদ্রিস দাড়ি কাটা ছেড়ে দিয়েছে। দু’জনেরই দাড়ি বেশ বড় হয়ে গেছে এ কয়েক মাসে। ওরা যেন চিড়িয়াখানার খাঁচায় বন্দি নিরীহ দুই পাণ্ডা। নির্লিপ্ত, নির্বিকার। যেন এটাই নিয়ম, এটাই তাদের নিয়তি। ওদের কিচ্ছু করার নেই। ওদের নিয়ে পত্র-পত্রিকায় লেখালেখি হচ্ছে, ছবি ছাপা হচ্ছে, টি.ভি. চ্যানেলে দেখাচ্ছে– খারাপ লাগছে না। ওদের তেমন কোনো অপমান করছে না জেল কর্তৃপক্ষ। এই মাঝে মধ্যে রিমান্ডে নিচ্ছে। তখন যা একটু প্যাদানি দিচ্ছে। দু’চার ঘা লাগাচ্ছে। গুঁতো মারছে। পোঁদে লাথি দিচ্ছে। শুয়োরের বাচ্চা, কুত্তার বাচ্চা বলে গালি দিচ্ছে। এ আর এমন কী? ছালামের বাবা তো আরও কত গৃহপালিত জন্তুর নাম করে গালি দিত। নিজের বাবাই এরকম, আর পরের বাবার কথা কী? তা দিক। ওদের ক্ষমতা আছে। অসম্মান তো আর করছে না। লাভের মধ্যে লাভ বিনা পরিশ্রমে খাবার পাচ্ছে। কবে ছাড়া পাবে কি পাবে না, এ নিয়ে তেমন কোনো ভাবনা-চিন্তা নেই। মাথা-ব্যথাও নেই। যেন ছাড়া না পেলেও চলে। জীবনটা কেটে যাবে এ ভাবেই। নিশ্চিত যেমন কবরে যেতে হবে, এটাও যেন তেমনই– নিশ্চিত জেলখানায় আসতে হবে। অবশ্য এই জেলখানাটাকেই কবর বলে মনে হয় ছালামের। পার্থক্য জেলখানায় খাবার দেয়, কবরে ফুল দেয়; জেলখানায় সাংবাদিক আসে, কবরে স্বজনেরা আসে। ‘শেষ বিদায় স্টোর’ এর বুদ্ধিটা খারাপ ছিল না। কী করে যে ছাইয়ের ব্যবসাটা মাথায় এল? এখন জীবনটাই ছাই হয়ে গেল।

ছালামের মাথায় একটা বুদ্ধি আসছে। যদি কোনো দিন কোনো কারণে ছাড়া পেয়ে যায় কোনো দৈত্য কিংবা দানোর কৃপায়, যাদুবলে; তবে সে আর ইদ্রিস সাধুবাবা হয়ে যাবে। গ্রামে গিয়ে কোনো একটা বুড়ো বটগাছের নিচে বসে যাবে। চুল-দাড়ি আর না কেটে গায়ে ছাই-ভস্ম মেখে ‘ছাইবাবা’ হয়ে যাবে। গাঁজায় দম দিয়ে গান গাবে ‘ছাইয়ের মানুষ ছাই নিয়া সারাদিন কাটাই, ছাইয়ের সঙ্গে কোলাকুলি, ছাইয়ের সঙ্গে গলাগলি, ছাইয়ের জন্য শেষ লড়াই’। কত শত ভক্ত পায়ের কাছে এসে গড়াগড়ি দেবে একটু পদধূলি পাবার আশায়। হাতে চুড়ির রিনিঠিনি আওয়াজ তুলে মেয়েরা আসবে প্রসাদের আশায়। বিভোর হয়ে চুড়ির শব্দ শুনতে থাকে। কিন্তু চুড়ির শব্দ এত জোরে কেন? তালা খোলার শব্দের মতো মনে হয়। ঘোর কাটতে খেয়াল হয় পুলিশ এসে গেটের তালা খুলছে। সাথে আরও জনা কয়েক লোক।

ছালামের দাড়িটা কিছুটা রবীন্দ্রনাথের মতো। ইন্টারপোলের দুই সদস্য এসছেন তদন্তের স্বার্থে তাদের সাথে দেখা করতে। তাদের মধ্যে একজন মি. ক্লিন কবিতাপ্রেমী। তিনি সাহিত্যের ছাত্র ছিলেন। সেই সুবাদে তিনি রবীন্দ্রনাথের ছবি দেখেছেন। মি. ক্লিন ছালামকে দেখেই উল্লসিত হয়ে উঠলেন– ‘মি. টেগর, হাউ সুইট দি গ্রেট বেঙ্গলি পোয়েট টেগর? হাউ আর ইউ মি. টেগর’? জেলার মনে করিয়ে দিলেন– ‘স্যার, হি ইজ নট টেগর। টেগর ইজ নো মোর, টেগর ইজ ডেড’। বিস্ময়ে ক্লিন এর মনেই ছিল না যে রবীন্দ্রনাথ মারা গেছেন। অনেক আগেই। মি. ক্লিন বললেন– ‘ও! লুকস লাইক টেগর। লাইক অ্যা পোয়েট। হি নেভার বিন অ্যা ব্যাড ম্যান, হি ক্যান নট বি এ টেরর’। মি. ক্লিনের রির্পোটের ভিত্তিতে মামা-ভাগ্নের কেস ক্লিন হয়ে গেল। দুজনকেই মুক্তি দেয়া হলো। বেকসুর খালাস।

বাচ্চারা হাতে ফুলানো বেলুন পেলে যেমন খুশি হয়; তেমনই ছালাম-ইদ্রিসের বাবা-মা সন্তান ফিরে পেয়ে খুশিতে ঝলমল। ছালাম আর ইদ্রিস যেন ফুলানো বেলুন। একটু পরেই ফটাস। তাই সে হাসি মিলেয়ে যেতেও বেশি সময় লাগে নি। ছালামের বাবা-মা দুজনকে ডেকে বললেন– ভালয় ভালয় মুক্তি পাওয়া গেল। এবার তোরা ভালো একটা কিছু কর। টাকা যা লাগে দেবো। তোদের যা করতে মনে লয় কর, বাধা দেবো না। নাকে খত।

মামা-ভাগ্নে একসাথে বলে উঠল– তাহলে 'শেষ বিদায় স্টোর' দেবো। একথা শুনেই মাথায় ঠাটা পড়ার মতো ছালামের মা মাথা ঘুরে মেঝেতে পড়ে অজ্ঞান। বাবা বলে উঠল– ন্যাও, ঠেলা সামলাও এবার। ব্যবসাটা এহান থিক্যাই শুরু করো; প্রথম বাক্সটা আমার কাছেই বেচো।

আদারি

– খোকা, তোমার নামটি?
উত্তরদাতা নিরুত্তর।
– তোমার বাবার নাম?
এবারেও নিরুত্তর।
– তোমার মাতুল বংশ কী?
গোল গোল চোখে নিশ্চুপ। কটমট তাকিয়ে আবার মাথা নিচু। কার্টুন ছবি যেন। গায়ে সোডা দিয়ে গতকালকে ধোয়া বেঢপ একটা জামা। লাল কটকটে রঙ। বোতামগুলো সাদা কালো হলুদ নীল নানা রঙের, রঙ-বেরঙের সুতোয় গাঁথা। নিজের জামা নেই বলে অন্যের কাছ থেকে ধার করা। মাথায় তেল জবজবে চুল। ঘানি ভাঙা সরিষার তেলে গন্ধে তেলেসমাত। মাঝখানে সিঁথি। মুখে মাখানো পাউডারের সাদা গুঁড়া। চোখে কাজল। পরনে চেক লুঙ্গি। ঠিক যেন সুকুমার রায়ের আঁকা ভোম্বল দাশের ছবি।
– খোকা, কুমড়ার মতো চুপ করে বসে আছ যে? কিছু বলছ না ক্যান?
এইসব প্রশ্নবাণে আদিত্য যখন জর্জরিত তখন সে আঙুলের নখ দিয়ে খাটালে হেঁচড়পেঁচড় কাটছিল। কলসির মধ্যে আবদ্ধ সিন্দবাদের দৈত্যের মতো ভেতরে ভেতরে রাগ গজগজ করছিল। আর আঙুলের ডগা বেয়ে সেই রাগ খাটালে দাগ কাটতে কাটতে গর্ত করে কেঁচো হয়ে মাটির ভেতর ঢুকে গেল। কিন্তু আদিত্যর মুখ দিয়ে কোনো কথা বেরুল না। তাকে মূক ও বধির ভাবাটা অসঙ্গত নয়। কিন্তু সে তা নয়। কেবল 'বদনা' হয়ে বসে আছে এখন। বস্তুত ওই আদিত্য নামটা সে ভুলেই গেছিল। তার নাম যে কোনো একদিন আদিত্য ছিল, তা আজ আর তার মনে নেই। এখন সে আদারি নামেই পরিচিত। ওই নামটাই প্রতিষ্ঠিত। খুব ছোটবেলায় বাবা মারা যাওয়ায় 'বাবা' যে কী বস্তু, তা সে জানে না। সে জানে, তার বাবা নেই; কোনকালে ছিলও না। তার বাবা থাকতে নেই। তাকে কেউ 'ওমুকের ছেলে' বলেও কখনও ডাকে না। আর মাতুল যে কী জিনিস তা সে বোঝে না। তাই ওসব প্রশ্ন তার কাছে অবান্তর মনে হয়েছে। ফালতু মনে হয়েছে। এর উত্তর অবশ্য আদিত্যর জানার কথা নয়। গতকালের কোনো ঘটনাও আদিত্যর মনে থাকে না, আরতো গত মাসের বা গত বছরের বা ছোটবেলার। অবশ্য জীবনের কোনো প্রশ্নের উত্তরই আদিত্যর কখনওই জানা নেই, জানা থাকে না। বুঝ হওয়ার পর থেকেই আদিত্য দেখে আসছে সংসারে তার মা আছে, একটা বেড়াল আছে। আর কেউ নেই। মা পরের জমিতে কাজ করে। কাস্তে কোটা ক্যারাইল হাতে ময়লা শাড়িতে পাগলের বেশে বাড়ি ফেরে। চুলে জটিল জটা। তেল সাবান দেয় কি দেয় না। রান্না-বান্না করে। খায়-দায়। ঘুমায়। এর বেশি তার জানা নেই। জগতে আর কিছুর যে প্রয়োজন আছে, তা সে জানে না। জানার দরকারও মনে করে না।
আদিত্য নামটা কালের গর্ভে হারিয়ে গেছে। এখন তার নাম আদারি। স্নান বলে তার অভিধানে কোনো শব্দ নেই। শেষ কবে স্নান করেছে তা সে বলতে পারে না। গায়ে নখের আঁচড় কাটলে খড়ি ওঠে। পাঁচড়া তার বারো মাসের সঙ্গী। পেকে গেলে জোঁক ধরে লাগিয়ে দেয় ঘায়ে। পাঁচড়া শুকিয়ে গেলে খুঁটে খুঁটে মুখে পুরে দেয়। চিবিয়ে চিবিয়ে খেয়ে ফেলে। নোন্‌তা লাগে। সারাক্ষণ গা চুলকাতে থাকে। মনে হয় নৃত্য করে। চুলকাতে চুলকাতে ডালিমের কোয়ার মতো রক্তের দানা বের করে ফেলে। দাঁতে নখ কাটে বলে তা বড় হতে পারে না। চুল যেন পাখির বাসা। জামা-কাপড় ধোয়া কাকে বলে তা তার জানা নেই। অবশ্য তার কোনো জামা-কাপড় আছে কিনা কেউ তা বলতে পারে না। কেউ কখনও তা দেখেও নি। শীত, গ্রীষ্ম বা বর্ষা যা-ই হোক বেশির ভাগ সময়ই একটা লুঙ্গি অথবা একটা হাফ-প্যান্ট পরা আর খালি গায়ে দৃশ্যমান আদিত্য। গায়ে পাঁঠার গন্ধ। এ সব কারণেই হয়ত লোকে তাকে আদারি বলে। আদারিকে কোনো কাজে ডাকো। করে দেবে। তার কোনো 'না' নেই। ক্লান্তি বা পরিশ্রমও নেই যেন। টাকা দেও, নেবে না। একশো দেও, দুশো দেও– নেবে না। যদি বলো আদারি কী চাস? বলবে– এক প্যাকেট স্টার সিক্রেট। তা পেলেই সে মহা খুশি। ওই একটিমাত্র জিনিসই যেন তার চাওয়ার আছে পৃথিবীতে। এক প্যাকেট স্টার সিক্রেট।

গাঁজার কল্কের মতো ভেতরে ভেতরে গরম হয়ে ওঠে আদিত্য। এটা কি স্কুল যে নামতা শেখায়? পাঠশালার মতো পড়া ধরছে। তাকে আবার 'খোকা' বলছে। সে কি কচি খোকা? খোকাতো মেয়েদের কোলে থাকে? দুধু খায়। তারা কী ভেবেছে তাকে? এখন যারা তার নাম জিজ্ঞেস করছে, তার বাবার নাম জিজ্ঞেস করছে, মেলা মেলা প্রশ্ন করছে– এইমাত্র তারা দই-মিষ্টি দিয়া চিড়া-মুড়ি খাইছে তাগো ঘরে– তারা আদিত্যকে দেখতে এসেছে। তাদের মেয়ের সাথে বিয়ে দেবে। অনেক ধৈর্য ধরে আদিত্য পেটফোলা পোটকা মাছের মতো চুপ মেরে বসে ছিল। কোনো প্রশ্নের উত্তর দেয় নি। রাগও দেখায় নি। কিন্তু কতক্ষণ? সহ্যেও তো একটা সীমা আছে? এর মধ্যে একজন বলে উঠল– কালা নাকি? আর একজন বলল– বোবা মনে অয়। ভিমরুলের চাকে যেন ঢিল পড়ল। আর পারল না। পৌরুষ জেগে উঠল তার। বাঁশ ফাটার মতো ফেটে পড়ল আদিত্য। হঠাৎ হুঙ্কার দিয়ে ওঠে–

– হালারা গেলি? আমাগো ওড়ুম চিড়া খাইছোস্ ক্যান? আবার কতা কস্? দেহাইছি তোগো বিয়া?

ইয়ে বড় আম কাঠের যে পিড়িখানায় আদিত্য বসে ছিল এতক্ষণ কাঠের পুতুল হয়ে, এবার জাম্বুমানের মতো সেটাই দুহাতে মাথায় তুলল। মাথার উপর দিয়ে চক্রাকারে ঘোরাতে লাগল। আক্রমণ। লঙ্কাকাণ্ড শুরু। ভাব বেগতিক দেখে কন্যাপক্ষ রাজা লক্ষ্মণ সেনের সৈন্যের মতো দৌড় লাগাল যে যার মতো। তারা বাড়ি ছেড়ে ঊর্ধ্বশ্বাসে পালাল। পেছনে আদিত্য একা সুগ্রীব। তাড়া করে ছুটল। বুনো শুয়োরের তাড়া খাওয়া হরিণের মতো কন্যাপক্ষ ছোটে। সে দেখার মতো দৃশ্য। শহরের মানুষ দেখলে নিশ্চিত ভাববে– এটা কোনো সামাজিক নাটকের শ্যুটিং। ধানক্ষেত ভেঙে কিছুক্ষণ দৌড়ল তারা। সবুজের মাঝে অবুঝদল। এরপর আদিত্য রণে ভঙ্গ দিল। কী মনে করে কুয়োর পাড় পিড়ি পেতে বসে পড়ল। একটা দুটো মাটির টুক্‌রো তুলে আইজ্যাক নিউটনের স্টাইলে কুয়োর জলে ঢিল ছুঁড়তে লাগল। এ খবর তেলাপোকার মতো সারা গ্রামে ছড়িয়ে পড়ল। এরপর আর কখনও কেউ বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে আদিত্যর মায়ের কাছে আসে নি। বিয়ে সম্বন্ধে কোনো প্রশ্নও তার মনে কখনও জাগে নি। আদিত্যও তাই চির অকৃতদার।

ঠাণ্ডা বা গরম বলে কোনো অনুভূতি ছিল না আদিত্যর কোনোকালে। প্রবল শীতেও খালি গায়ে থাকত। আবার প্রচণ্ড গরমেও জামা গায়ে দিয়ে থাকতে পারত। সর্বদা ফিট। সে কোনো চটি পরত না পায়ে। সব সময় খালি পা। তাই তার কোনো চটি নেই। একবার বেড়াতে যাবে কোথাও। এক জোড়া চটি ধার নিল পাশের বাড়ির খগেনের থেকে। কিন্তু পায়ে দেয় নি। কেমন অস্বস্তি হয়। বাবুবাবু লাগে। লজ্জা করে। চটি জোড়া বগলদাবা করে বেড়াতে গেছিল, আবার বগলদাবা করেই ফিরে এসেছিল। তা দেখে গ্রামের মেম্বার বলাইচাঁদ জিজ্ঞেস করেছিল– কী রে আদারি, বগলে কি তোর ওটা ভ্যানিটি ব্যাগ? এক গাল হেসে বলেছিল– আমার সাথে ঠেলেস করো মেম্বার, আমি কি বলদ? আর যা-ই হোক মুখে তার রামকৃষ্ণ মার্কা একখানা হাসি লেগে থাকতই সব সময়। যেন রামকৃষ্ণের ছোট ভাই।

আদিত্য একটা চাকরি পায় অবৈতনিক। ভেসাল ধরা। কাজটা তার পছন্দের। খাওয়া পরা ছাড়াও রোজ এক প্যাকেট স্টার সিগারেট চুক্তি। সন্ধে থেকে ভোর পর্যন্ত ভেসাল ধরা। শুধু সকাল বেলা ছুটি। ঘুমনোর জন্যে। তারপর দুপুর থেকে আবার। বৃষ্টি-বাদল-ঝড়। শীতের রাত। গ্রীষ্মের দুপুর। কুয়াশা। কাইচান। কুচ্ পরোয়া নেই, আদিত্য আকাশে। মানে ভেসালের উপরে। কখনও গুন্‌গুন্ গান করে। কখনও উচ্চকণ্ঠে– আগের নাও পাছে গ্যালো, পাছের নাও আগে। আমার হার কালা করলাম রে। সাধের লাউ বানাইল মোরে তরকারি। ভেসালে হেলান দিয়ে পাহাড় ঘুমায় ওই। আরও কত কত গান, যার মানে সে জানে না, বোঝে না; জানতে বা বুঝতে চায়ও না, চেষ্টাও করে না। বানিয়ে বানিয়েও গায়। আর চুপ মেরে বসে থাকে শূন্যে। হাতের সুতো বেয়ে মাছের আতার পেলেই দড়িতে টান দেয় আদিত্য। বাঁশের বাহনে নেমে আসে জলের কিনারে। জাল ঝেড়ে মাছ তোলে নায়ে। আপন মনে মাছের সাথে কথা কয়। জালের সাথে কথা কয়। মাছ না পেলে ভগবানকে গালাগালি করে। মাছকে গালাগালি করে। পৃথিবীর সবচেয়ে পছন্দের কাজ তার ভেসাল ধরা। আর এ কাজটা সে ভালোই পারে। ভেসাল ধরায় তার বেশ সুনাম আছে। স্টার সিগারেটের বিনিময়ে কয়েকজনকে সে ভেসাল ধরার টের্নিংও দেছে। ছইয়ের মধ্যে ঘুমায় বিপদভঞ্জন রায়। সংক্ষেপে বিপদ। ওই নামেই সবাই তাকে ডাকে। জালের মালিক। সকালে উঠে মাছ নিয়ে আড়তে যায় বেচতে।

এক রাতে ঘুমের মধ্যে শুনতে পায় বিপদ 'ঝুপ্'। একটা শব্দ। ঘুম ভেঙে যায়। তাড়াতাড়ি উঠে পড়ে। টর্চের আলো মারে আকাশে। আদিত্য নাই। টর্চ মারে নিচে। আদিত্য নাই। আদিত্য উধাও। ভোজবাজি। চিন্তার বিষয়। কিন্তু না, চিন্তা করতে হলো না। আদিত্যকে নিয়ে কারো কখনও চিন্তা করতে হয় না। পাতাল ফুঁড়ে বেরুল। কচুরির ভেতর থেকে ভোস্ করে মাথা জাগাল আদিত্য। ঘুমে তার ঝিমুনি এসেছিল। তাই বৃন্তচ্যুত। পড়ে যায় জলে। তলিয়ে যায় কচুরিপানার নিচে। বেশ খানিকক্ষণ পরে শুশুকের মতো ভোস্ করে জেগে ওঠে। টর্চের আলোয় উজ্জ্বল হয়ে ওঠে আদিত্যর মুখ। সামান্য লজ্জা মেশানো। এক গাল নির্মল হাসি– প্রায় গুমাইয়া পড়ছিলাম কাগা।

কচুরি ফাঁক করে বেশ কয়েকটা ডুব দেয়। গা ডলে ডলে স্নান করে। যেন এ জন্যই জলে নেমেছে সে।

– ম্যালা দিন নাওয়া অয় নাই। কয়ডা ডুব দিয়া হেলাই। গায়ে হিদাল পড়ছে।

পৌষের এই শীতের রাতে বিপদের ভিড়মি খাবার যোগাড়। নিষ্পলক তাকিয়ে থাকে তার দিকে। বলে–

– আইজ আর কাম নাই ভেসাল ধরার। ঘুমা। কিছু খাবি?

– এট্টা স্টার সিক্রেট দ্যাও। ম্যালা ক্ষিদা পাইছে।

বয়স অনেক হলেও পড়ালেখা অনেক হয় নি আদিত্যর। থ্রি-ফোর পর্যন্ত টেনেটুনে চলছিল। একটা ঘটনায় স্কুল ছেড়েছে। আর যায় নি। হেডমাস্টারের কপালে দোয়াত ছুঁড়ে পালিয়েছিল। সেই শেষ। তারও কারণ ছিল। পড়ালেখায় এ যুগের আইনস্টাইন। গ্রীষ্মের ছুটি হবে। বাংলা স্যার জিজ্ঞেস করেছিলেন–

– স্কুল ছুটির পর তুমি কী করবে আদারি?

– স্যার, স্কুলে আসার সময় পথে হৈলের পোনা দেখছি। স্কুল ছুটির পরে হৈল মাছ কোপাবো।

এ কথায় দোষ কী তা সে বুঝতে পারে না। স্যার উঠে গিয়ে বলা নাই কওয়া নাই তার পিঠে চটাৎ চটাৎ কয়েক ঘা বেত লাগিয়েছিল। কিচ্ছু বলে নি আদিত্য। তবে সুযোগ বুঝে স্যারের পাঞ্জাবির পকেটে চোল্তার পাতা রেখে দিয়েছিল। এরপর স্যারের সে যে কী তিড়িং বিড়িং কায়দা!

ইংরেজি স্যার জিজ্ঞেস করেছিল–

– বল্তো, আমার একটা কুকুর আছে, ইংরেজি কী?

– আই এ্যাম এ ডগ।

ক্লাসের সবাই হো হো হেসে উঠেছিল কেন তা সে বোঝে নি।

অঙ্ক স্যার একদিন প্রশ্ন করেছিল–

– বল্তো আদারি, এক হালি কলার দাম দুই টাকা হলে এগারটা কলার দাম কত?

– স্যার, কাঁচা কলা, না পাকা কলা?

– ধর পাকা কলা।

– স্যার, কী কলা, চম্পা কলা, না সবরি কলা?

– ধর সবরি কলা।

– স্যার, ছোট, না বড়?

– ধর বড় কলা।

– স্যার, দেশি কলা, না হাইব্রিড কলা?

– ধর দেশি কলা।

– স্যার, যান না বাজারে, দুই ট্যাকা কলার আলি, আপনেরে ছুইল্যা খাওয়াইয়া দেবেনে?

– বেতমিজ, এতবড় আস্পর্ধা?

এই বলে বেধড়ক পিটুনি। সে দোষের কী বলল, তা তার বোধগম্য হলো না।

স্কুলে নিয়ম ছিল তামাক কিংবা বিড়ি-সিগারেট খাওয়া যাবে না। খেলে প্রমাণসাপেক্ষে দশ জোড়া বেত্রাঘাত। হেডমাস্টার নিজে ছাত্রদের ডেকে ডেকে পরীক্ষা করতেন। ডান হাত এবং বাঁ হাত নাকের কাছে নিয়ে শুঁকতেন। আদিত্যর ডান হাতে একবার বিড়ির গন্ধ পাওয়া গেল। আর যায় কই? বেত্রাঘাত। আদিত্য যতই বলে– স্যার আমি বিড়ি খাই নাই, স্যার তত বেশি পিটায়। বলে–

– তুই খাস নাই, তো তোর হাতে গন্ধ এল কোত্থেকেরে উজবুক? হনুমান এসে তোর হাতে বিড়ি খেয়ে গেছে?
– স্যার, আমি গুমাইছিলাম। ক্যাডা জানি আমার হাতে বিড়ি রাইখ্যা খাইয়া গেছে। আমি ট্যার পাই নাই।
এ কথা হেডমাস্টার বিশ্বাস করেন নি। তাতেই রাগ। কাছে ছিল কালির দোয়াত। হেডমাস্টারের কপাল লক্ষ্য করে তেণ্ডুলকারের বলের মতো দোয়াত ছুঁড়ে দে ভোঁ দৌড়। একেবারে বাউন্ডারির বাইরে। সেই শেষ স্কুলে যাওয়া। তিনি নির্জ্ঞান। রক্তে আর দোয়াতের কালিতে মেঝে অদ্ভুত আলপনার সৃষ্টি। ঘণ্টাখানেক বাদে হেডমাস্টারের মর্ত্যে প্রত্যাবর্তন। চোখ খুলেই বললেন– টুণ্ডাটা কই? কপালে তিনটে সেলাই পড়েছিল। তিন রাত তিন দিন বিছানায়। এক রাতে মাথায় ব্যান্ডেজ নিয়ে হেডমাস্টার এসে হাজির আদিত্যদের ঘরে। দরোজা একটাই। পালাতে পারে নি। স্যার ঢুকেই কিষ্কিন্দাধিপতির মতো বসে পড়লেন দরোজার কাছে রাখা পিড়িতে। বললেন–
– স্কুলে যাস্ না ক্যান? মেরেছিস্ কলসির কানা, তাই বলে কি প্রেম দেবো না? স্কুলে যাবি। স্কুল হলো গিয়া...
প্রেমের কথা শুনে মাথায় রক্ত উঠে গেল আদিত্যর। মনে হলো কেউ তারে জ্বলন্ত সিগারেটের ছ্যাঁকা দেছে। তেলাপোকার মতো স্যারকে কোনোমতে পাশ কাটিয়ে তার ঘাড়ের উপর দিয়ে লাফ মেরে উড়াল। বেরিয়ে কুত্তাদৌড়। আর পায় কে? রাতকানা হেডমাস্টার ধরতে পারে নি তাকে। সে রাতে আর ঘরে ফেরে নি। ঘরামিদের পুকুরপাড়ে গাছের ডালেই কাটিয়ে দিয়েছিল সারারাত। ঘুমের সময় পড়ে যাবার ভয়ে ডালের সাথে নিজেকে ভালো করে বেঁধে নিয়েছিল গামছা দিয়ে। ভোরবেলা প্রেমানন্দ পুকুরপাড়ে এসেছিল 'ইয়ে' সারতে। আদিত্যকে ওই অবস্থায় দেখে তার 'ইয়ে' মাথায় উঠেছে। ভেবেছে গলায় দড়ি দিয়েছে। দে চিৎকার গলা ফাটিয়ে। লোকজন এসে হাজির। ততক্ষণে চোখ মেলে তাকিয়েছে আদিত্য। প্রথমে ঠাহর করতে পারে নি সে এখানে কেন, তারা ওখানে কেন? আঁচ করতে পেরেই মনে পড়ল ঘটনাটা– হেডমাস্টারের প্রেম দেয়ার কথা, রাতের পলায়নের কথা। কিছু না ভেবেই দিল লাফ। ডালের সাথে গামছা বাঁধা, তা ভুলেই ছিল। ঝুলে রইল ডালেই। গলদা চিংড়ির মতো ছটফট করতে লাগল। লোকেরা ধরাধরি করে গিঁট খুলে নিচে নামাল। প্রেমানন্দের পায়খানা সেদিন মুলতবি হলো।
হেডমাস্টারও অবশ্য আর প্রেম দিতে আসে নি কোনোদিন। সেও আর স্কুলে যায় নি কখনও। স্কুলে অবশ্য ভেসালধরা, মাছমারা, বড়শিপাতা, দাওনদেয়া, কুয়াসেচা, হালচষা, ধানকাটা শেখায় না। নামতা শেখায়, অঙ্ক শেখায়। দুধে জল মেশানো শেখায়। বানরের বাঁশ বাওয়া শেখায়। মানুষের বাঁশ বাওয়া শেখায় না। মানুষের কিচ্ছু শেখায় না। যা শেখায় তাতে ওদের কোনো কাজ দেয় না। স্কুলে শেখায়– অ-য় অজগর আসছে তেড়ে, আমটি আমি খাব পেড়ে; ইঁদুরছানা ভয়ে মরে, ঈগল পাখি পাছ ধরে। সে অবশ্য অজগর তেড়ে না এলেও আমটি পেড়ে খেতে পারে। কার কোন্ গাছের আম কেমন, তা তার জানা। ইঁদুরছানার লেজ ধরে ঘোরাতে পারে। সাপ ধরতে পারে। ব্যাঙ ধরতে পারে। স্কুলের শিক্ষা কোনো কাজে লাগে না তার। আদিত্যর তাই স্কুল নিয়ে কোনো উদ্বেগ নেই, আফসোস্ নেই। স্কুল থাক স্কুলের জায়গায়, আদিত্য ভেসালে। আদিত্যর অতীত নেই, ভবিষ্যৎ নেই– একমাত্র বর্তমান আছে। স্মৃতি নেই, স্বপ্ন নেই– শুধু বাস্তবতা আছে। আদিত্য এক ও অবিনশ্বর, চিরস্থির ভেসালে।
আদিত্য হাসলে তার বত্রিশটা দাঁত দেখা যায়। দিলদরাজ হাসি। দাঁতের মাড়ি পর্যন্ত বেরিয়ে থাকে। দাঁতগুলো যেন হরতালের ছত্রভঙ্গ মিছিল। যে যেখানে পেরেছে অস্তিত্ব ঘোষণা করেছে। গৌরাঙ্গ দিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। কিছু কিছু দাঁত যেন দাবানলে পুড়ে যাওয়া গাবগাছের মতো। তার খাদে খাদে খাদ্য জমা। গত জন্মের, বিগত জন্মের, পরজন্মের– সব। দাঁত মাজা কী জিনিস তা সে জানে না। বোঝে না। বিপদভঞ্জন একদিন বিপদে পড়েছিল ওকে একটু পেস্ট দিয়ে। দাঁত মাজতে। মিষ্টি মিষ্টি লাগে। দুঘঁষা দিয়ে তা সে গিলে ফেলেছিল। এরপর সুযোগ পেলেই সে পেস্ট খেত। ব্যাপারটা গোপন থাকে নি বিপদের কাছে। একদিন ধরা পড়ে যায় হাতেনাতে। দেখে রুটিতে পেস্ট লাগিয়ে খায়। এই পেস্ট খাওয়ার কারণেই একদিন তার বিনা বেতনের চাকরিটা চলে যায়। বিদায় নেবার সময় বিপদকে সটান প্রণাম করে বলে গেল–
– কাগা, অপরাধ ক্ষ্যামা করে দিও। তয় এককান কতা, মাছ ব্যাচতে গঞ্জে গ্যালে আমার জইন্যে এক প্যাকেট স্টার সিক্রেট আনবা।

চাকরি চলে যাওয়ার পর আদিত্য পার্ট টাইম কাজ করে। যার যখন যে কাজে আদিত্যকে দরকার, তার ডাক পড়ে। পেটে-ভাতে আর এক প্যাকেট স্টার সিক্রেট। অনেকদিন যাবৎ আদিত্যর কাশি। সারে না। কাশতে কাশতে কুঁজো দিয়ে যায়। গায়ে ঘাম ছোটে। মনে হয় দম শেষ হয়ে যাবে। ঝড়ো হাওয়ার মুখে কেরোসিন বাতির মতো। নিবু নিবু। ডাক্তার কবিরাজের ধার ধারে না সে। কাশি এলে তুলসীপাতা খায়। আদা খায়। ফুলাইর মা'র জল পরা খায়। শিবু মোড়লের তাবিজ কবজ বান্ধে। ভালো হয় না। কাশির সাথে একদিন যখন রক্ত বেরুল তখন থানা হাসপাতালে গেল। পরীক্ষা করে ডাক্তার বলল– যক্ষ্মা। তখনও তার মুখে সেই নির্মল হাসি। যক্ষ্মা রোগটি তাকে বিচলিত করল না। ওটা কী রোগ তা সে বোঝে না। 'যক্ষ্মা' শব্দটা তার পছন্দ হলো। শুনতে বেশ মজার। নতুন একটা রোগ হয়েছে তার– খুশি খুশি মনে রওনা দিল বাড়ির দিকে। হাসপাতাল থেকে পাওয়া ওষুধ হাতে করে বাড়ি ফিরল। কিন্তু ওষুধ তার খাওয়া হলো না ঠিকমতো। কোন্‌টা কখন খাওয়ার কথা তা সে ভুলে গেল, কাউকে জিজ্ঞেসও করল না। ডাক্তার যে কাগজটা তাকে দিয়েছিল ওষুধের নাম লিখে, তা পেঁচিয়ে বিড়ির মতো করে কানে গুঁজে রেখেছিল। কখন কোথায় যে পড়ে গেছে, তা সে জানে না। তাই ওষুধ যখন যেটা খেতে ইচ্ছে হয়েছে, খেয়েছে।

বেশ কিছুদিন আদিত্যর খোঁজ নিতে পারে নি বিপদ। আজ গেছিল গঞ্জে। আদিত্যর কথা মনে হলো। মনে করে তার জন্য এক প্যাকেট স্টার সিগারেট কিনে এনেছে। বাড়ি ফিরে খাওয়া-দাওয়া শেষ করতে দেরি হলো। রাত হয়ে গেছে বলে আজ আর যাওয়া হলো না। ঘুম ভাঙে একটা দুঃস্বপ্ন দেখে। সকালে সিগারেট প্যাকেট হাতে করে আদিত্যদের বাড়ি পৌঁছায় বিপদ। আদিত্যর মায়ের মড়াকান্না শুনতে পায় সে। পা দুটো টলে ওঠে তার। কাছে গিয়ে দেখে নিথর পড়ে আছে আদিত্যর দেহ। তা জড়িয়ে ডুকরে কাঁদছে আদিত্যর মা। উঠোনে শুয়ে আছে একটা কুকুর। আর রয়েছে বাড়ির লোকজন। কিছুক্ষণ নিশ্চুপ দাঁড়িয়ে থেকে ফিরে চলল বিপদ। পথের পাশে ময়লার স্তূপে ছুঁড়ে ফেলে দেয় সিগারেটের প্যাকেটটা। তারপর জামার খুঁটে চোখ মোছে। বিপদের মনে হলো পেছন থেকে আদিত্য বলছে– কাগা, এক প্যাকেট স্টার সিক্রেট।

মহুয়ার জন্যে অপেক্ষা

– দাদা, গৃহে আছেন কাল সন্ধেয়? মং আসবে। পাহাড়ি বন্ধু মং। তার সাথে মহুয়া। পাহাড়ি কন্যা মহুয়া। বান্দরবান থেকে রওনা দিয়েছে ভোর ভোর। আজ ঢাকায় পৌঁছাবে। কাল আপনার ডেরায়। কাল কনে দেখা আলোয় মহুয়ার দেখা। ঠোঁটে মহুয়ার ছোঁয়া। স্বর্গীয় সুখ। চোখে সর্ষে ফুল। 'আলোর নাচন পাতায় পাতায়'। দেখবেন আপনি সাঁওতাল রাজা বনে গেছেন। নিজকে দেবদূত মনে হবে।
– তাই নাকি? মহুয়া? 'তারে আমি চেখে দেখি নি, তার অনেক গল্প শুনেছি'। ওকে কখনও ছুঁয়ে দেখি নি। হলে মন্দ কী? আছি সন্ধেবেলা। এসো।
– সে এক জিনিস, দাদা। কী বলব আপনাকে, টলটলে চেহারা । আমি বলি 'সোনালি শিশির'। গায়ের গন্ধটা একটু আঁশটে। পাহাড়ি বলে কথা। স্বাদটা মিষ্টি মিষ্টি। নেশা যা হয়! মনে হয় পাহাড়ের ঢাল বেয়ে হাঁটছি আদিম মানব। পা টলমল পাহাড়ি খাদে। স্বাধীন আদম। 'নিটোল পায়ে রিনিক ঝিনিক'। পাখির ডানায় ওড়া। নিজকে মনে হবে ওড়াং ওটাং। শাখামৃগ। শাখায় শাখায় বিচরণ। রাতে হবে মধুঘুম।
কলির সন্ধেয় নয়, কথা হচ্ছিল বৃহস্পতির সন্ধেয়। গতকাল। আজ তার আসার কথা। মহুয়ার। তার অপেক্ষায় বসে আছি। চড়াই উৎরাই পেরিয়ে আমার ঘরে আসবে পাহাড়ি কন্যা। চুম্বনে চুম্বনে ছুঁয়ে দেবে চোখের পাতা। নেশায় জড়াবে, জুড়োবে আমার চোখ। তার জন্যে উৎকণ্ঠা তো হবেই। যেন এখনই শোনা যায় 'নিটোল পায়ে রিনিক ঝিনিক'। বেশ একটা উত্তেজনা। সন্ধে সাতটায় আসার কথা গৌতমের। সাথে মং। আর পাহাড়ি তন্বী। সাড়ে সাতটা বাজে। এখনও পৌঁছল না। দেরি হতেই পারে। রাস্তা-ঘাটের যা অবস্থা! 'গাড়ি চলে না, চলে না'। যা হোক এসে পড়বে। জলের বোতল, কাপ, বরফকুচি, কাজুবাদাম সব রেডি করে অতিথির জন্যে অপেক্ষা। WAITING FOR MOHUA. রাত আটটা বাজে। কিছুটা উৎকণ্ঠা আর উদ্বেগ জাগে মনে। দেখা যাক আরও কিছুক্ষণ। সাড়ে আটটা। এবার তো চিন্তার কথা। আর একটু পরেই ফোন করতে হবে। রাত ন'টা। এখন ফোন না করলেই নয়। কিন্তু না এলে তো ফোন করবে? তাও করছে না। ভাবছি। এমন সময়েই ফোন এল–
– দাদা, ওরা গতকাল রওনা দিতে পারে নি। বান্দরবানে হরতাল নয়, বেতাল ছিল। আজ রওনা দিয়েছে। আগামীকাল সন্ধেয় আসবে। আজকে আর হচ্ছে না। এ জন্যে দুঃখিত। সবুরে মহুয়া ফলে।
শনির সন্ধ্যা। আসবে বলে বসে আছি। সাতটা, সাড়ে সাতটা, আটটা, সাড়ে আটটা। অবশেষে ন'টা। এল। তবে গৌতম নয়। মহুয়া? মহুয়াও নয়। ফোন। গৌতমের ফোন। 'আসি আসি বলে মহুয়া ফাঁকি দিয়েছে'।
– দাদা, ওরা এসেছে। ঢাকায় পৌঁছেছে। তবে রাস্তায় জ্যাম ছিল। এক নেতার পোষা কুকুর রোড এক্সিডেন্টে মারা গেছে (ইন্না লিল্লাহে ওয়ানে ইল্লাহে রাজিউন)। তাই নিয়ে রাস্তা অবরোধ। পুলিশ এসে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। পৌঁছতে দেরি হয়েছে। একটু আগে এসে পৌঁছেছে। ক্লান্ত। আজ আর হচ্ছে না। কাল সন্ধেয়।
রোববার সন্ধে সাতটা। মহুয়া আসবে। অতএব অপেক্ষা। কিন্তু কেউ আসে না। আজও সাতটা, সাড়ে সাতটা, আটটা, সাড়ে আটটা। অবশেষে ন'টা। কেউ এল না। ফোন করেও কিছু জানায় না। কাহাতক সহ্য করা? ফোন করতে গিয়েও ইচ্ছে হলো না ফোন করি। ফোন করব না, দেখি কী করে? এমন সময় ফোন বেজে উঠল–
– দাদা, বলেন তো আমি কোথায়?
– জাহান্নামে।
– কাছাকাছি। একটা শ্মশান আছে এখানে। শ্মশান, যাকে বলে মহাসাম্যসংস্থাপক। রাজা উজির সব ছাই এখানে। 'মহাশ্মশান' উপন্যাসে কায়কোবাদ বলেছেন না– 'ছেঁড়া ছাতা রাজছত্র মিলে চলে গেছে এক শ্মশানের দিকে'।
– ওটা রবীন্দ্রনাথ বলেছেন 'বাঁশি' কবিতায়। শ্মশান নয় বৈকুণ্ঠ।
– ওই একই কথা। যেই শ্মশান, সেই বৈকুণ্ঠ। সব কবি মিলে মূলত এক কথাই কয়।

– বেশ তো। ‘কা তব কান্তা, ঐ তো শ্মশান দেখা যায়’ –ঝাঁপ দেও। আগুন তোমাকে ছোঁবে না।
– যথার্থ। দাদা, আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখেন, কী সুন্দর আকাশটা।
– আমার বাসা থেকে আকাশ দেখা যায় না। চারদিকে গগণচুম্বী অট্টালিকা কালো কালো ভূতের মতো দাঁড়িয়ে রয়েছে। আর দেখা গেলেও এই রাত ন'টার সময় তা সম্ভব নয়। অমাবস্যার রাতে আকাশ দেখা আর চোখ বন্ধ করে বসে থাকা একই কথা।
– ঠিক বলেছেন। শরৎচন্দ্র অবশ্য অন্য কথা বলেছেন– ‘আঁধারেরও একটা রূপ আছে’। অজস্র নক্ষত্র। ‘তারায় তারায় খচিত’। ‘আকাশের ঐ মিটিমিটি তারার সনে কইব কথা’।
– কও কথা। তুমি শ্মশানে কেন? সন্ন্যাসী হয়ে গেলে নাকি? শ্মশানযোগী? নাকি ‘গৃহদাহ’ কিংবা গৃহযুদ্ধ?
– সে তো নিত্য সন্ধ্যা-আহ্নিকের বিষয়। সৈকতের বালুর মতো, ঝারা দিলে ঝরে যায়। দাগ বসে না।
– তবে, চিত্ত কেন ব্যাকুল হলো শ্মশানপানে?
– রেডি হয়ে বেরিয়েছি। আপনার বাসায় যাব। আকাশের দিকে তাকালাম। ‘জ্বলে উঠল আলো’। মনটা কেমন উধাস উধাস হয়ে গেল। পাখি হয়ে গেলাম।
– কী পাখি?
– ফিঙ্গে।
– কেন? কেন? ফিঙ্গে কেন? উটপাখি মন্দ কী? সাইজটা জুতসই।
– মনে হলো। তাই। কোথায় যাব, মনে করতে পারলাম না। আঙিনা হলো বিদেশ-দূর। স্মৃতি প্রতারণা করল।
– তারপর?
– তারপর এই শ্মশানে। তুরাগের তীরে নিভৃত শ্মশান। বড় মনোরম। মনে পড়ে গেল এ জায়গাটার কথা। ‘ছায়া সুনিবিড়, শান্তির নীড়’।
– ছায়া পেলে কোথায়? ওখানে তো কোনো গাছপালা নেই। তার ওপর রাত।
– এখন তো রাত। রাতে ছায়া হতে কোন গাছ লাগে না। রাতের ছায়া। চলে এলাম।
– কোনো চিতা সাজানো আছে?
– আছে। কিন্তু কোনো শব নাই। তাই নিজেই শুয়ে পড়েছি। আপনি যথার্থ বলেছেন– আগুন আমাকে ছোঁয় না।
– আগুন থাকলে তো?
– সত্যি তাই। শুধু কাঠ সাজানো। মরার পরে কী অবস্থা হয়, বোঝার জন্যে রিহার্সেল দিচ্ছি। পা চুলকায়, মশায় কামড়াচ্ছে। শুয়ে আছি।
– বেশ, থাকো। বাই।
– দাদা, একটা কাণ্ড হয়েছে একটু আগে।
– মূল ছাড়াই কাণ্ড হলো? কী কাণ্ড?
– কয়েকটা ছেলে এসেছিল বোতল নিয়ে মদ্যপান করবে বলে। আমাকে দেখে মৃত ভেবে বোতল-টোতল ফেলে দৌড়ে পালিয়েছে। ভূত কিংবা ভগবান ভেবেছে হয় তো বা।
– ভোলানাথও ভাবতে পারে। স্বয়ং মহাদেব। শ্মশানে সাজিয়াছো যোগী।
– হতে পারে। বোতলটা আমার হাতে শোভা পাচ্ছে।
– আর শুয়ে শুয়ে তুমি সেটা মুখে ঢালছ? মা কালীর প্রসাদ গিলছ?
– একজ্যাক্টলি। চিতায় শুয়ে শুয়ে মদ্যপানের থিওরিটা মন্দ নয়।
– বেশ। করো পান। কারণবারি সেবন করো। কিন্তু সাবধান, মরে যাবার বদলে ঘুমিয়ে পড়ো না যেন। ওরা ফিরে এসে মুখাগ্নি করে যেতে পারে। তখন কিন্তু রিহার্সেলে সীমাবদ্ধ থাকবে না ব্যাপারটা। স্টেজ শো হয়ে যাবে।
– দাদা, শোনেন। কাল সন্ধেয় কোনো ভুল হবে না।
– কী ভুল হবে না?

– মং আসবে। সাথে মহুয়া।
– রাখছি। বাই। শুভ হোক তোমার শ্মশানশয্যা।
ইচ্ছে করেই ওসব আর মাথায় আনি নি সোমবার। ওর যা খুশি করুক। মরুক গিয়ে মহুয়া। মহুয়াকে নিয়ে শ্মশানে চলে যাক। চিতায় উঠে ঘুমিয়ে পড়ুক। কার কী এসে যায়? মজার বিষয় হলো– এত কিছুর পরেও মাথা থেকে নামে না মহুয়ার ভূত। বেতালপঞ্চবিংশতির ভূতের মতো ঘাড়ে চেপে বসেছে। কী এক নেশা? পানের আগেই টান। অচেনা আকর্ষণ। তার চেয়ে আশ্চর্যের বিষয় হলো– মহুয়া দূরে থাক, সোমবার গৌতমের ফোনও এল না। মেজাজ ঠিক রাখাই কঠিন। মঙ্গলবার এল ফোন।
– দাদা, একটা ঝামেলা হয়ে গেছে গতকাল। গোদের উপর বিষফোঁড়া।
– মানে? কী ঝামেলা?
– সি.এন.জি. করে ওরা আসছিল মগবাজার হয়ে। পথে পুলিশ আটকে দেয়। গাড়ি থামিয়ে চেক করে। বোতল দু'টো পায়। ওতে কী আছে জিজ্ঞেস করলে মং বলে,'পানি আছে'। পুলিশ বলে, 'বেশ পানি তেষ্টা পেয়েছে, একটু খাব'। মং তাড়াতাড়ি বলে ওঠে, 'খাবেন না, খাবেন না, ওতে পানি না, অন্য কিছু'। ব্যস। গেঁরো কাকে বলে? বাঘে ছুঁলে এক ঘা, পুলিশে ছুঁলে আঠারো ঘা। দিল আটকে। মাদক ব্যবসায়ী? পাহাড়ি মদ এনে রাজধানীতে সাপ্লাই? নিরীহ রাজধানীবাসীদের মাতাল বানানোর পাঁয়তারা? আশ্রয় শ্রীঘর। আমাকে ফোন করলে তাড়াতাড়ি মোটর সাইকেল নিয়ে বেরিয়ে পড়ি। গিয়ে পুলিশকে বলে-কয়ে ছাড়িয়ে আনি। এক বোতল রেখে দিল। এক বোতল নিয়ে এলাম। নাক লাগিয়ে দেখলাম কেমন গন্ধ গন্ধ হয়ে গেছে। আসতে দেরি হয়েছে তো, তাই। কাল পর্যন্ত ঠিক থাকলে নিয়ে আসব। এই ঝামেলার জন্যে গতকাল আসতে পারি নি, ফোনও করার সময় পাই নি। মোবাইলে অবশ্য চার্জও ছিল না। আজকে বিশ্রাম।
– বেশ তো। তুমি শয্যা গ্রহণ করো। ভূমিশয্যা। ছাড়ছি।
– কাল মং আসবে। সন্ধে সাতটায় আপনার বাসায়।
– বিশ্বাস করি না।
– নিশ্চিত। এবার কোন ভুল হবে না।
– তোমাকে বিশ্বাস করে সন্ধেটা মাটি করতে চাই না।
– একটিমাত্র সুযোগ চাই আপনার শ্রীচরণে।
– না।
– শেষ চান্স।
– বেশ।
দু'বোতল দোচোয়ানি। আড়াই লিটার করে দু'টো সেভেন আপ এর বোতল। স্পেশাল মহুয়া। ঘঁষা কাচের মতো রঙ। আঁশটে গন্ধ থাকলেও মিঠা। এর স্বাদই আলাদা। জব্বর নেশা। দু'পেগ পেটে গেলেই পিলে চমকে যাবে। এক রাতের বাদশা। মহুয়ার গেলাস হাতে নিজকে ভাবতেই বিস্ময় লাগে। 'বিস্ময়ে তাই জাগে, জাগে আমার গান'।
বুধবার। সন্ধে সাতটা। অপেক্ষা। অপেক্ষা নয় প্রতীক্ষা। সাত-সাতটা দিনের প্রস্তুতি। সাত দিন ধরে আসি আসি। 'মহুয়া করেছে আড়ি, আসে না আমার বাড়ি'। 'সহজে বুঝি এর মন মেলে না'? একটা রোমান্স রোমান্স ভাব। প্রথম মহুয়া পানের আয়োজন। অবশেষে সময় হলো। পাখি ডেকে উঠল– পিউ পিউ পিউ– ডোরবেল বাজল। নিজেই গিয়ে হুড়মুড় দরজা খুললাম। অভ্যর্থনা জানাতে হবে তো? সত্যি এল। গৌতম নয়। মং। দেখেই বুঝে নিলাম– এ মং। মং ছাড়া আর কেউ হতেই পারে না। দু'টো কেন, একটিও নয়। সাথে কোনো বোতল নেই। একটি মেয়ে। রজনীগন্ধার মতো ছিপছিপে। হা হতোস্মি! এ কেমন রসিকতা? বিশ্বাসের পরিণাম এই? জিজ্ঞেস করলাম– এ কে মং?
– আমার বুন। মহুয়া।
আমি থ'। কবিরা কেন 'দেহলতা' বলে, মহুয়াকে দেখে বুঝলাম।

কেমন আছেন আপা

– কেমন আছেন আপা?
– আর থাকা! মোটেই ভালো যাচ্ছে না দিনকাল। ভালো নেই। রোগ মোটে আর সারে না। দিনের পর দিন খালি অসুখ, অসুখ আর অসুখ। হাঁচি-কাশি, সর্দি-জ্বর, গাব্যথা-গলাব্যথা– কী নেই! হাঁচি ভালো হয় তো কাশি হয়, সর্দি যায় তো জ্বর আসে, গলাব্যথা সারে তো বাতের ব্যথায় ধরে। জানো, মাঝেমাঝে অমাশয়ও হয়। আর পারি না। অসুখ যেন পাড়ার ফেরিওয়ালার মতো, নিত্যই হাঁক দিয়ে আসছে আর যাচ্ছে। শুধু কি আমার একার? বাসার সবার। অসুখ যেন জায়গা বদল করছে। মানুষ যেমন হাওয়া বদল করে, অসুখ করছে দেহ বদল। এ দেহ ছেড়ে ওদেহ। মানুষ যতটা না ভালোবাসে আমাদের, অসুখ তার চেয়ে বেশি ভালোবাসে। আর গুচ্ছের টাকা যাচ্ছে। প্রতিদিন যে কত টাকা যাচ্ছে ওষুধের পেছনে! আর ডাক্তারের ভিজিটও কি কম? ফতুর হয়ে গেলাম। ডাক্তার রহিম শেখ তো শুনতে পাই আমাদের ভিজিটের টাকাতেই তিনতলা বাড়ি বানিয়েছে। ক'দিন ধরে গলায় খুব ব্যথা, কাশিও আছে বেশ। যক্ষ্মা টক্ষ্মা হলো নাকি আবার কে জানে? ক্যান্সারও হতে পারে। দেখো না, কথা বলতে খুব কষ্ট হচ্ছে। দাঁড়াও একটু পানি খেয়ে নেই। পানির অপর নাম জীবন কি আর সাধে?
আমি আবার ব্যাগে বোতল ভরে সবসময় পানি রাখি। বলা তো যায় না কখন তেষ্টা পাবে বা কোন্ প্রয়োজনে লাগবে? সেদিন যেমন, বাসে মাথাটা বেজায় ঘুরছিল। বের করে মাথায়, চোখেমুখে পানি দিলাম। ভালো লাগল। আর একদিন বাসে বমিই করে দিয়েছিলাম। বাসটাও ছিল লক্কর-ঝক্কড় মার্কা। লোকাল। সবাই বলে মুড়ির টিন। ওই যে, জগন্নাথ কলেজ থেকে ছাড়ে। রামপুরা যায়। গাড়িতো নয় যেন খেকশিয়াল। দুর্গন্ধ ছড়াতে ছড়াতে চলে। চৈত্রের দুপুরের গরম, পেট্রোল পোড়া গন্ধ, ড্রাইভার ব্যাটাও পাজি, খালি হর্ন বাজায়। হাসপাতালের সামনে লেখা– জোরে হর্ন বাজানো নিষেধ। তবুও বাজায়। চালায়ও কেমন বেধড়ক। আমার একেবারে বমি হয়ে গেল। ছিলাম দাঁড়িয়ে। বসার জায়গা কোথায় বাসে, একেবারে ঠাসাঠাসি। ভিড়। ছাগল ঠাসা ভিড়। কোরবানির আগে ভ্যানে দেখেছো, কেমন ছাগল ঠাসা? ভক্‌ভক্ করে বমি করে দিলাম এক লোকের টাক মাথায়। কী বিশ্রী কাণ্ড! বমি যেন ভূমিকম্পের লাভার মতো। বেরিয়ে এল। লোকটা তো রেগে আগুন। কী করা! এই পানির বোতলটা ছিল বলেই রক্ষা। তাও পানিটা কী পানি! কর্পূর মেশানো পানি। কী সুন্দর গন্ধ! আমি কর্পূর মেশানো পানি ছাড়া খেতেই পারি না। খেতেই পারি না তা নয়, খাই না। খাই না যে ঠিক তাও নয়, খেতে পছন্দ করি না। মানে খেতে ভালো লাগে না। বইয়ে পড়েছি, আগের দিনের লোকেরা কর্পূর মেশানো পানি খেত। কর্পূর মেশানো পানি ঠাণ্ডা, সুস্বাদু এবং সুগন্ধি। তখন তো ফ্রিজ ছিল না! এখন ফ্রিজ আছে, তাও একদিন ভাবলাম কর্পূর মিশিয়ে খেয়ে দেখি তো, কেমন লাগে! ওমা, কী মিষ্টি! ঠিক মিষ্টি নয়; কর্পূর মেশালে কি মিষ্টি হয়? মিষ্টি মানে খুব সুস্বাদু। তাও শুধু কর্পূর মেশানো পানি নয়। পানিটাকে প্রথমে ছেকে ধরা হয় কল থেকে। তারপর ফিটকিরি দিয়ে থিতানো হয়। তারপর সেই পানি ফুটিয়ে ঠাণ্ডা করা হয়। তারপর আবার ছেকে ফিল্টারে দেয়া হয়। সেই পানিতে কর্পূর মেশানো হয়। যেনতেন পানি নয়। ফিল্টারটাও খুব দামি। সাড়ে চার হাজার টাকা দিয়ে কিনেছি বায়তুল মোকার্‌রম থেকে। বায়তুল মোকার্‌রম মানে বায়তুল মোকার্‌রম মসজিদ ভেবো না, বায়তুল মোকার্‌রম মার্কেট। অবশ্য বায়তুল মোকার্‌রম মার্কেট না বলে স্টেডিয়াম মার্কেট বলাই ভালো।
বায়তুল মোকার্‌রম মার্কেটে তো খালি সোনার দোকান। অবশ্য খালি সোনা নয়, সোনা আর টুপির দোকান। অবশ্য সোনা আর টুপি ছাড়াও মসজিদের নিচের অংশে ইলেক্ট্রনিক্সের দোকান আছে। সেখানেও ফিল্টার পাওয়া যেতে পারে হয়ত। হয়ত কী, পাওয়া যায় মনে হয়। আমি সেখান থেকে কিনি নি। স্টেডিয়াম মার্কেট থেকে কিনেছি। তাও পনেরটা দোকান ঘুরে, যাচাই করে। না পনেরটা না, পরে আরও দু'টোয় যাচাই করেছি। মানে কেনার পরে। বলতে পারো সতেরটা দোকান ঘুরে একটা ফিল্টার কিনেছি। বুঝতেই পারছ কেমন ফিল্টার। দেখলেই তোমার পানি খেতে ইচ্ছে করবে। তেষ্টা না থাকলেও ফিল্টারটা দেখলেই তোমার তেষ্টা পাবে।

পাড়ার কত ছেলেরা ওই ফিল্টারের পানি খাবার লোভে আসে! এসেই বলে– আপা, একটু পানি খাব। আপনার বাসার পাশ দিয়ে হেঁটে গেলেই গন্ধ পাই। পানি পিপাসা পায়। যা একখানা ফিল্টার কিনেছেন? আগে অবশ্য পাজিগুলা আমাকে চাচি বলে ডাকত। একদিন বকে দিয়েছি– খবরদার, চাচি কী রে, আপা বলবি, নইলে ঠ্যাং ভেঙে দেব। আমার মেয়ে টিয়া ক্লাস টেনে পড়ে বলেই কি আমি চাচি হয়ে গেছি? এরপর থেকে আর আমাকে চাচি বলে না, আপা বলে। এসেই বলে, আপা টিয়া নাই, পানি খাব। আমি বলি, টিয়া কেন, আমিই তো দিতে পারি? ওরা বলে, আপনার কষ্ট হবে। আমি বলি কী কষ্ট আর! নে, খা, কত খাবি? খাবি তো একটু পানি? পানি ছাড়া আর তো কিছু খাবি না? তাও কি খাওয়াতে পারব না? ছেলেগুলাও যা দুষ্টু না, বলে কী– আপা, শুধু পানি কি খাওয়া যায়? সাথে একটু টোস্ট, নয়ত বিস্কুট, অন্তত নোন্‌তা বিস্কুট, তারপর এক গেলাস পানি। স্বচ্ছ আয়নার মতো। যেন ডিস্টিল্ড ওয়াটার। মানে কী বলব! সেই পানি! সেই পানি দিয়ে ভালো করে মুখ ধুলাম। চোখেমুখে ঝাপটা দিলাম। তারপর ভদ্রলোকের টাক মাথায় পানি ঢেলে নিজ হাতে ধুয়ে, ভ্যানিটি ব্যাগ থেকে রুমাল বের করে মাথা মুছিয়ে দিয়ে সুচিত্রা সেনের ঢঙে একটু মুচ্‌কি হেসে 'স্যরি' বললাম বেশ মিষ্টি করে। ব্যস্‌। বরফ গলে পানি। দেখো না আমি কেমন মিষ্টি করে কথা বলি! ঠিক এরকম মোলায়েম করে বললাম– স্যরি, আমি অত্যন্ত স্যরি, আমাকে ভুল বুঝবেন না, কোথা থেকে কেমন করে কী যে হয়ে গেল! –এভাবে বলতে বলতে আল্‌তো করে ভাঁজ না ভাঙা রুমাল দিয়ে, ধপ্‌ধপে সাদা রুমাল, ঢাকা কলেজের বিপরীতে যে দোকানটা আছে না, সিদ্দিকস্‌, একদরে সব বিক্রি হয়, সেই দোকান থেকে কেনা চাইনিজ রুমাল, পঁচাত্তর টাকা পিস্‌, ফিক্সড প্রাইজ, নরম রেশমের মতো মোলায়েম, তাও আবার সার্ফ এক্সেলে ধোয়া, ইস্ত্রি করা– সেই রুমাল দিয়ে আদর করে মুছে দিলাম। ভদ্রলোক রাগবে কী, কৃতজ্ঞতায় গদগদ। যেন আমি নই, সে-ই আমার গায়ে বমি করে দিয়েছে, অন্যায়টা তারই। আর কর্পূর মেশানো পানিতে ধোয়া না! পানিটা শুকিয়ে গেল কিন্তু গন্ধটা থেকে গেল। এরপর থেকে এই পানিটা আমার আরও প্রিয় হয়ে গেল। ভদ্রলোক গুলিস্তানে নেমে গেলেন। যাবার সময় খুব মিষ্টি হেসে, বিনম্র যাকে বলে, সেভাবে গেলেন। মনে হচ্ছিল সুবোধ ঘোষের 'জতুগৃহ' গল্পের মতো। যাবার সময় একটা ভিজিটিং কার্ড দিয়ে গেলেন। আর বললেন কী জানো– যদি আমাকে মনে পড়ে কখনও, কিংবা কাজের ক্ষতি না হয়, কিংবা অনুকম্পা জাগে, ফোন করবেন।

আমি অবশ্য বাসায় বলি নি ঘটনাটা। বলা যায় কী, পুরুষ মানুষের মন, কীভাবে নেবে আবার! তোমাদের দুলাভাই আবার সন্দেহপ্রবণ, তাই বেমালুম চেপে গেছি। তবে ফোন করেছি মাঝে সাজে ভদ্রলোককে। তাই বলে আবার ভেবে বসো না– আমি প্রেমে মজে গেছি, ডুবে ডুবে জল খাচ্ছি। সে বয়স কি আর আছে এখন? ওই দেখো, পানি খাওয়াই হলো না, পানিটা একটু খেয়ে নি। গলায় খুব ব্যথা। কষ্ট পাচ্ছি। দেখছো না কেমন কাশি হচ্ছে! এজন্যই কথা একটু কম বলছি। ডাক্তার কথা বলতে একদম নিষেধ করে দিয়েছেন। বলেছেন– স্রেফ পনের দিন ভয়েস রেস্ট। তাছাড়া পরীক্ষার হলে কথা বলা উচিতও নয়। ছাত্রদের ডিস্টার্ব হয়। অনেক টিচার আছে পরীক্ষার হলে বকরবকর করতেই থাকে। আমি বাবা ওসব পছন্দ করি না। আজকে ওরা বংলা পরীক্ষা দিচ্ছে। আমার সাবজেক্ট না? আমাকে দেখেই ওদের মনে সাহস বেড়ে গেছে। কথা বলার আর কী আছে?

তবু একটু আধটু কথা না বলে পারা যায় বলো? আরে মুখ আছে, ঠোঁট আছে, জিভ আছে– কথা বলব না, তা কখনও হয়? ডাক্তার যা-ই বলুক। তবে কথা একটু কম বলছি ডাক্তারের অনারে। কথা না বলতে পারলে আমার দম বন্ধ হয়ে আসে। যখন কেউ থাকে না, তখন আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিজের সাথে নিজে কথা বলি। নিজের সাথে নিজে কথা বলে দেখেছ কখনও? বলে দেখবে, আলাদা মজা আছে। সবচেয়ে মজার ব্যাপার– ঝগড়া করতে চাইলেও আয়নার অন্য মানুষটার সাথে তোমার ঝগড়া হবে না। যখন কথা বলার লোক না থাকে, তখন আয়নায় নিজের সাথে কথা বলি। তবে এখন কম বলি। কথা বলা ডাক্তারের নিষেধ কিনা! এই তো পরশুদিন বিকেলে গেলাম ডাক্তারের কাছে। নাক, কান, গলা বিশেষজ্ঞ। বিকেল কেন বলছি, রাত আটটায়। রাত আটটা কি বিকেল হয়? সাথে আমার হাজব্যান্ড। ওমা, ডাক্তারের চেম্বারে ঢুকেই অবাক। এ কী! এ কাকে দেখাতে এলাম? এ যে সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়! আরে সৌমিত্র, অভিনেতা সৌমিত্র! আমি তো অবাক। কিছুক্ষণ কথাই বলতে পারি নি। সিনেমার নায়ক সৌমিত্র ডাক্তারি করেন? পরে ভাবলাম–

যাঃ বোকার মতো কী সব ভাবছি? ইনি অভিনেতা সৌমিত্র হবেন কেন? ইনি তো ই.এন.টি. স্পেশালিস্ট ডা. জহির। আগের থেকেই এ্যাপয়েন্টমেন্ট করা। ইনি সৌমিত্র চ্যাটার্জি হবেন কেন? চেহারাটা না এক্জ্যাক্টলি সৌমিত্র। কথা বলার ধরন, হাসি, একেবারে সৌমিত্র। সত্যি কথা বলতে কী– মনে কিছু করো না, ভেতরে ভেতরে আমার রোমান্স হচ্ছিল। মনে হচ্ছিল আমার বয়স আটচল্লিশ না, আঠারো। রীতিমতো ঘামছিলাম। আমার হাজব্যান্ডকে অবশ্য বুঝতে দেই নি। উনি তো আবার সন্দেহপ্রবণ! আমার না তখন নিজকে অপর্ণা সেনের মতো লাগছিল। ডাক্তার বললেন– কী হয়েছে আপনার? মনে হলো সৌমিত্র অপর্ণা সেনকে জিজ্ঞেস করছেন– কী হয়েছে আপনার? আমি খুব মিষ্টি করে বললাম– গলায় খুব ব্যথা। কথা বলতে খুব কষ্ট হচ্ছে। খুব মিষ্টি করে। আমি তো এমনিতেই খুব মিষ্টি করে কথা বলি, তার চেয়েও মিষ্টি করে। মোলায়েম ভাবে। শুনে ডাক্তার বললেন– কই এই তো সুন্দর করে কথা বলছেন। আপনি ঠাণ্ডা কিছু খেয়েছিলেন? আইসক্রিম খেতে পছন্দ করেন?

অইসক্রিম আমার অসম্ভব প্রিয়। চকবার আর ক্রাঞ্চি। এ দু'টোই আমার বেশি পছন্দের। কোন্ আইসক্রিমও অবশ্য বেশ ভালো লাগে। আইসক্রিমের কথা শুনেই না আমার জিভে পানি এসে গেল। আসলে আইসক্রিম খেয়েই ঠাণ্ডাটা লাগল। প্রচণ্ড গরমে ঠাণ্ডা খাওয়ার পরপরই গলাটা বসে গেল। আমি অবশ্য জানি, গরমের সময় ঠাণ্ডা খেলেই গলাটা বসে যাবে, তাই বলে কি এই লোভ সামলানো যায় বলো? জিভের ডগায় তেঁতুলখানি, গাল ভরে আসবে না পানি– তা কি হয়? ডাক্তার ঠিকই ধরে ফেললেন। টর্চলাইট দিয়ে হাঁ করিয়ে মুখের ভেতর, মানে গলার ভেতরটা দেখলেন। দেখে বললেন – ফেরিংজাইটিস্। পনের দিন ভয়েস রেস্ট। আইসক্রিম বা যে কোনো ঠাণ্ডা খাওয়া বন্ধ।

আজ মাত্র তিন দিন হলো। আরও বারো দিন বাকি। মানে এক সপ্তাহ, প্লাস পাঁচ দিন। তারপর আবার দেখা করতে বলেছেন। আমার তো প্রতিদিনই দেখা করতে যেতে ইচ্ছে করে। কিন্তু এত ঘন ঘন যাওয়াটা কি ঠিক হবে বলো? হ্যাংলা ভাববে না? তাছাড়া ভিজিটও তো রয়েছে। প্রথমবারে তিনশো টাকা। তারপর প্রতিবারে দু'শো করে। ঝট্পট ওষুধ লিখে খস্ করে প্যাড থেকে প্রেস্ক্রিপশনের কাগজটা খুলে দিয়ে বললেন– পনের দিন পরে দেখা করবেন। আর যা যা বললাম, পালন করবেন। আমার আরও কিছুক্ষণ বসে থাকতে ইচ্ছে হচ্ছিল। কিন্তু কী করে বসে থাকি বলো? সেটা কি শোভন হতো? তাছাড়া বাইরে তেলাপোকার মতো গিজগিজ করছে পেশেন্ট। তার অত সময় কই গল্প করার? তাই উঠতে হলো। চেয়ার থেকে উঠতেই সৌমিত্রের ঢঙে বলে উঠলেন– Wish you good luck.

আমি বেরিয়ে আসছি, মনে হচ্ছিল অপর্ণা সেন প্লাটফর্মের ওয়েটিং রুম থেকে বেরুচ্ছে তার হাজব্যান্ডকে নিয়ে। ওয়েটিং রুমে বসে থাকল সৌমিত্র। আমার হাজব্যান্ড একেবারে সঞ্জীবকুমার। সঞ্জীবকুমারকে চিনেছো? আমার হাজব্যান্ডকে তো দেখো নি! লাইক সঞ্জীবকুমার। ওই যে, 'সিলসিলা' ছবিতে অমিতাভ বচ্চনের পার্শ্বচরিত্রে অভিনয় করেছে? রেখার হাজব্যান্ড হিসেবে? মনে পড়েছে? তারপর 'হারানো সুর' ছবিতে সুচিত্রা সেনের বিপরীতে অভিনয় করেছে। তেরে বিনা জিন্দেগি মে কোই শিকওয়া তো নেহি, শিকওয়া নেহি, শিকওয়া নেহি . . . শিকওয়া নেহি– গানটা গেয়েছিল। কিশোরকুমারের কণ্ঠে। আমার কণ্ঠে শুনতে কেমন লাগল? বেশ, তাই না? লাগবেই তো? আমার কণ্ঠটা কিছুটা লতা মুঙ্গেশকারের মতো। ছবিটায় সে কী অভিনয়! আর সুচিত্রা সেনের সে কী চাউনি! আমার হাজব্যান্ডের চেহারাটা এক্কেবারে সঞ্জীবকুমার। অবশ্য এখন দেখলে তা বুঝতে পারবে না তোমরা। এখন তো মাথায় টাক পড়ে গেছে। সেই চেহারাও আর নেই। আমারও কি সেই চেহারা আর আছে? এক সময় সবাই আমাকে ফ্লাইং বার্ড বলত। চেহারাটা ছিল হেমামালিনী কায়দার। এখন তো আর সেই বয়স নেই, চেহারার জৌলুসও নেই। আমার সেই চেহারা দেখেই তো আমার হাজব্যান্ড এক বাক্যেই সায় দিয়েছে। ওর ভাইঝি ছিল আমার ছাত্রী। কলেজের যে কোনো ফাংশনে আমার গান গাওয়া চাই-ই। গান গাইতে দিতে না চাইলেও জোর করে গাইতাম। প্রিন্সিপ্যাল তো আমাকে ময়ূরকণ্ঠী বলেই ডাকতেন। কেউ কেউ রসিকতা করে বায়োসকণ্ঠীও বলতেন। আমি বলতাম– বায়োস অর্থ তো কাক? ওরা বল তো, কাকের কণ্ঠস্বর নাকি সবচেয়ে মধুর। বোঝ তাহলে? যাহোক, অনেকেই আমাকে 'এ যুগর লতা' বলত।

আমার মতো এত প্রিয় শিক্ষকও আর কেউ ছিল না। সব ছেলেমেয়েরাই আমাকে পছন্দ করত। আমার পড়ানোই তাদের ভালো লাগত। কী সুন্দর যে পড়াতাম! আমি পড়াতাম 'রক্তাক্ত প্রান্তর' নাটক। অভিনয় করে করে নেচে নেচে অঙ্গ দুলিয়ে পড়াতাম। জোহরা বেগমের সে কী সংলাপ! নিজেই যেন জোহরা বেগম হয়ে যেতাম। পড়াতে পড়াতে গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠত–

'শক্তির যে সুশিক্ষা তোমার কাছ থেকে লাভ করেছি, তার ক্ষমতাকে অত অবহেলা কোর না। জোহরা বেগমকে জীবন্ত আটকে রাখবে এমন শক্তি তোমার প্রহরীর নেই। রাত্রি শেষ হবার আগেই দেখবে হয় তোমার প্রহরীর নয় তোমার পত্নীর রক্তে মারাঠা শিবির রঞ্জিত' কিংবা ওই ডায়লগটা 'এই শিবিরে তোমার আমার মাঝখানে আমার পিতার লাশ শুয়ে আছে। আমি তোমার কাছে এগুবো কী করে'? কী দুর্দান্ত সংলাপ! এখনও মুখস্থ। দ্যাখো, গায়ে আমার কাঁটা দিয়ে উঠছে। দেখেছো? আমার হাতের লোমগুলো একটু বড়ো বড়ো। আমার হাজব্যান্ড অবশ্য বড়ো লোম পছন্দ করেন। রক্তাক্ত প্রান্তর নাটকের সংলাপগুলো বিয়ের পরে আমার হাজব্যান্ডকে প্রায়ই শোনাতে হতো। শুনতে শুনতে দেখতাম প্রায়ই ঘুমিয়ে পড়ত। সে কী সংলাপ!

'তুমি সাড়া দিলে না কেন? কেন জেগে উঠলে না? কেন ঘুমিয়ে পড়লে? আমি এত কষ্টের আগুনে পুড়ে, মনের বিষে জরজর হয়ে, এত রক্তের তপ্ত স্রোত সাঁতরে পার হয়ে তোমাকে পাবার জন্য ছুটে এলাম, আর তুমি কিনা ঘুমিয়ে পড়লে? . . . কষ্ট। ঘুমের বড়ো কষ্টে তুমি ভুগেছো। ঘুমাও। আরও ঘুমাও। প্রাণ ভরে ঘুমাও'। আমার এই সংলাপগুলো শুনে আমার হাজব্যান্ড বলতেন– তুমি রক্তকরবীর নন্দিনী চরিত্রে অভিনয় করলে সবার চেয়ে ভালো করতে।

ছাত্র-ছাত্রীরাও অভিভূত হয়ে যেত। আমার ক্লাস করার জন্য ছাত্র-ছাত্রীরা পাগল। একদিন বেলা আড়াইটার সময় দেখি আট/নয় জন ছাত্র-ছাত্রী ক্লাসে বসে আছে। আমি বললাম– এই দুপুরের সময়ও তোমরা না খেয়ে বসে আছো কেন? ওরা বলল– আপা, আপনার ক্লাস করার জন্য। আপনার ক্লাস খুব ভালো লাগে।

ক্লাসে আমি অভিনয় করে পড়াতাম তো! পরীক্ষার খাতা বাসায় আনলে আমার হাজব্যান্ড মাঝে মধ্যে খাতা দেখে দিত। বলত– তুমি যে বিষয় পড়াও, সে বিষয়ই তো ছাত্ররা ভালো লিখেছে। অন্য টিচাররা কী পড়ায়? কলেজের এইসব কাজের জন্য শহরে আমার সুনাম ছড়িয়ে গেল। স্মার্ট, সুন্দরী, স্টাইলিস্ট ম্যাডাম। অবিবাহিতা। আমার হবু বর তার ভাইঝিকে ডেকে জিজ্ঞেস করল– মিলি, তোদের বাংলা ম্যাডাম কেমন রে? মিলির কাছে আমার বিষয়ে সব শুনল। মিলি জিজ্ঞেস করেছিল– ম্যাডামের কথা জানতে চাও কেন চাচা?

আমার হবু বর বলেছিল– না, এমনিই।

এভাবেই কথাবার্তা এগুতে লাগল বিয়ের। দেখতে আসার দিন তারিখও ঠিক হয়ে গেল।

– এ কী! এই ছেলেমেয়েরা, এত কথা বলছো কেন? এটা কি মাছের বাজার পেয়েছো? এটা পরীক্ষার হল? চুপচাপ পরীক্ষা দাও। আমরা কথা বলছি বলে কি তোমরাও কথা বলবে? আচ্ছা অশোক, পরীক্ষার হলে বসে কি এত কথা বলা উচিত? এত কথা কোথায় বললাম? আমার তো গলা ব্যথা, কথা বলাই বারণ! এই মেয়ে, কী চাই? কাগজ? এত কী লেখো? বারবার কাগজ চাচ্ছো? চেষ্টা করবা কম কথায় বেশি কিছু বোঝাতে। এই অশোক, দাঁড়াও, যেও না। মেয়েটাকে একটা কাগজ দিয়ে আসি।

– তারপর যা বলছিলাম, বিকেলবেলা কনে দেখা আলোয় তারা এল। আমাকেও সাজিয়ে গুজিয়ে হেমামালিনী করে ছাড়ল। সত্যি, আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে চিনতে পারছিলাম না নিজেকে। কেমন যেন লাগছিল আমার। পছন্দ করবে তো? এভাবে দেখাদেখির ব্যাপারটা আমার ভালো লাগছিল না। নিজেকে পণ্য মনে হচ্ছিল। যদি পছন্দ না হয়? যদি 'না' বলে চলে যায়? এতদূর এগিয়ে যদি বলে পছন্দ হয় নি, তাহলে তো বিষয়টা পণ্যের মতোই হলো। আমার বান্ধবীরা বলতে লাগল– তুই একটু দেখে নে আগে থেকেই।

তো কীভাবে দেখব? কী করা হলো– দরোজার পাশে একটা চেয়ার দেয়া হলো। দরোজাটা সামান্য ফাঁক করে উপর দিয়ে দেখতে হবে। ওদিক থেকে আমাকে দেখতে পাবে না। আমি ছিলাম তখন সঞ্জীবকুমারের ফ্যান। সঞ্জীবকুমারের ছবি মানে আমার দেখা চাই-ই। যেই চেয়ারের উপর দাঁড়িয়ে, দরজা সামান্য ফাঁক করে, উপর দিয়ে তাকিয়েছি, আমার চোখকে বিশ্বাস করতে পারছিলাম না। একেবারে সঞ্জীবকুমার আমাদের বাড়িতে। আমার প্রায় মূর্ছা যাবার মতো অবস্থা। চেয়ার থেকে পড়েই যাচ্ছিলাম। ওরা ধরে না ফেললে কেলেঙ্কারিই হয়ে

যেত। আমি তো মনে মনে বলতে লাগলাম– উনি যেন 'হ্যাঁ' বলেন। হলোও তাই। এক কথায় 'হ্যাঁ'। ব্যস্, তারপর বিয়ে।

আমার হাজব্যান্ডকে যদি দেখতে– একেবারে সঞ্জীবকুমার। সেদিন ডাক্তারের কাছে যখন গেলাম, মনে হলো সৌমিত্রের কাছে সঞ্জীবকুমার এসেছে। আমাকে সুচিত্রা সেনও ভাবতে পারো, আবার অপর্ণা সেনও ভাবতে পারো। এবার কলেজের ম্যাগাজিনটা দেখেছো? আমার ছবিটা বিউটিফুল হয়েছে না? কেমন কচি কচি লাগছে না? ওটা আমার বিয়ের আগের বছর তোলা ছবি। ইচ্ছে করেই ওই ছবিটা দিয়েছি। কলেজের ম্যাগাজিনে বলো, বুড়ি বুড়ি ছবি দিতে কি ভালো লাগে? বিয়ের পরে আমার হাজব্যান্ড বলত– চোখ দু'টো টানা টানা, একেবারে বনলতা সেনের মতো। জীবনানন্দ বেঁচে থাকলে হয়ত আমাকে নিয়েও একটা কবিতা লিখত। আমার যা সুন্দর ভ্রূ ছিল! এখন তো ভ্রূ নেই, এই যা দেখছো না, এতো পেন্সিলে আঁকা? বোঝা যায়? কেমন সুন্দর এঁকেছি বলো? মনে হয় আসল ভ্রূ। আর্টেও আমার হাত ভালোই ছিল। কী না পারতাম? সবতাতেই আমার যোগ্যতা ছিল। দশভুজা যাকে বলে।

– এই ছেলেমেয়েরা, পরীক্ষার হলে এত কথা বলছো কেন? চুপচাপ পরীক্ষা দাও। বেশি কথা বলা আমি পছন্দ করি না। এই অশোক, দাঁড়াও, যেও না। তোমার এত তাড়া কীসের? Duty আছে? কোন্ রুমে? আর দু'মিনিট দাঁড়াও। জরুরি কথা আছে তোমার সাথে। একটা কাগজ দিয়ে আসি।

এই গলদা চিংড়ির মতো ছটফট করছো কেন যাবার জন্য? আমি কি বেশি বকবক করছি? বিরক্ত হচ্ছো তুমি? এখন তো আমার ভয়েস রেস্ট চলছে। কথা বলা বারণ আছে ডাক্তারের। তাছাড়া বেশি কথা বলা আমি পছন্দও করি না। 'কেমন আছেন' জিজ্ঞেস করেছো বলেই না ডাক্তারের কথা বললাম। নইলে কে বলে এত কথা? এই শোন, আসল কথাই তো বলা হয় নি? তোমাকে একটা কথা জিজ্ঞেস করবো বলেই না ডেকেছি। এই তো সেদিন তোমার সাথে ফোনে কথা বলতে বলতে কী যে হলো বুঝলাম না। লাইনটা কেটে গেল কি না, আবার মনে হলো কাটে নি। কী হয়েছিল বলো তো? অবশ্য একটু বেশি রাতই হয়ে গিয়েছিল ফোনটা করতে। তখন মনে হয় রাত দেড়টা কি দু'টো। ঘড়ি দেখি নি। ঘড়ি দেখে কি কেউ ফোন করে, বলো? রাত দেড়টা বা দু'টো কী এমন রাত হলো বলো? এ তো প্রায় সন্ধ্যা রাতই। তুমি তো অনেক রাতে ঘুমাও। সেদিন জরুরি একটা কথা বলতে তোমাকে ফোন করেছিলাম। ঠিক জরুরি নয়, তবে তোমাকে না বলে পারছিলাম না। বাসায় অনেক গেস্ট ছিল। তাই একটু দেরি হয়ে গিয়েছিল ফোনটা করতে। তোমাকে না বলতে পেরে দম বন্ধ হয়ে আসছিল। তুমি তো সেদিন যাও নি কলেজে। কী যে করো বাসায় বসে একা একা ছেলে ছোকরা মানুষ! তোমাদের বয়সে আমি সারাদিন কলেজে পড়ে থাকতাম। সেদিন কলেজে গিয়েছিলাম সালোয়ার কামিজ পরে। বহু বছর পর সালোয়ার কামিজ পরলাম। তোমার দুলা ভাইর মাথায় টাক পড়ার পর এই প্রথম সালোয়ার কামিজ পরলাম। দু'দিন আগে অবশ্য চুলটাও ছেটেছি। পার্লার থেকেই চুলে কলপ দিয়ে এসেছি। ভাবলাম, যা রোদ, চোখে রোদচশমা পরে নেই। ম্যাচ করে জুতা পরলাম, মোজা পরলাম, লিপস্টিক, আইলাইনার, আইশ্যাডো, চুড়ি, চেইন। একটা টিপও পরলাম।

কলেজে ঢুকতেই ছেলেমেয়েদের সে কী উল্লাস! আরে কী ঘটেছিল জানো? সেটা বলতেই তো তোমাকে ফোন করেছিলাম। সবাই আমাকে নিয়ে বলাবলি করছিল। ছেলেমেয়েরা বলছিল– আপা, আপনাকে একদম চেনাই যায় না। আমরা তো ভাবছিলাম কলেজেরই কোন ছাত্রী বোধ হয়। একটা ছেলে এগিয়ে এসে বলে– আপা, আপনাকে যা লাগছে না! ভাবতেই পারি নি আপনি? আর একটু হলে তো জোরে প্রায় শিস্ই দিয়ে ফেলেছিলাম। পরে দেখি আপনি। কী দুষ্টু ছেলেটা! আর একটা ছেলে বলে কী– আপা, ও তো শিস্ দিতে যাচ্ছিল। আর একটু হলে তো আমি লাভ লেটারই দিতে যাচ্ছিলাম। –কী পাজি! আমিও না ওদের মতো হয়ে গেলাম। গেয়ে উঠলাম– আষাঢ় শ্রাবণ, মানে না তো মন, ঝরোঝরো ঝরোঝরো ঝরিছে, তোমাকে আমার মনে পড়িছে। একটা দুষ্টু ছেলে বলে উঠল– আপা, এটা আষাঢ় মাস, না জ্যৈষ্ঠ মাস?

– সে কী কাণ্ড! সে কথা বলতেই তো তোমাকে ফোন করা। রাত দেড়টা কী এমন বলো? তা সেদিন কী হয়েছিল বলো তো? দিন বলি কেন, রাত। সে রাতে কী হয়েছিল বলো তো? তুমি কি আমার কথা শুনতে পাচ্ছিলে না? নাকি টেলিফোন লাইন খারাপ ছিল? ওদিক থেকে মাঝে মাঝে তোমার কোন সাড়া পাচ্ছিলাম না। খানিকক্ষণ বাদে বাদে মাঝে মাঝে তুমি হুঁ হাঁ করছিলে। মনে হচ্ছিল আমার কথা তুমি শুনতে পাচ্ছিলে

না। হঠাৎ হঠাৎ অসংলগ্ন দু'একটা হুঁ হাঁ বলে তুমি লাপাত্তা। তোমার কোনো সাড়া শব্দ নেই। অত রাত বলেই কি তুমি বিরক্ত হচ্ছিলে? নাকি তোমার মজা লাগছিল না ঘটনাটা শুনতে? নাকি ঘুম পাচ্ছিল খুব? মাঝে মাঝে মনে হচ্ছিল বালিশের উপর ফোন রেখে দিয়ে তুমি তোমার কাজ করছো। কিছুক্ষণ পর পর ফোন ধরে হ্যাঁ হ্যাঁ করে আবার বালিশের উপর ফোন রেখে দিচ্ছো। বালিশের উপর বললাম কেন, কথা বলতে বলতে এক সময় দেখলাম তুমি একেবারে চুপ। কিছুই বলছো না।

ফোনের দিকে তাকিয়ে দেখলাম মাত্র আটত্রিশ মিনিট কথা বলা হয়ে গেছে। আটত্রিশ মিনিট কম নয়। তবে মাত্র এক ঘণ্টাও হয় নি। আমি কারো সাথে এক ঘণ্টার কম কথা বলি না। তবু, ভাবলাম আর বিরক্ত করা ঠিক নয় তোমাকে। তাই কয়েকবার অশোক, অশোক, অশোক . . . বলে ডাকলাম। সম্ভবত সাতবার। লাকি সেভেন। কোনো সাড়া নেই। শুধু নাক ডাকার শব্দ। সাথে সাথে মান্না দের ওই গানটা মনে পড়ল আর গাইতেও থাকলাম– গভীর হয়েছে রাত, পৃথিবী ঘুমায়, হয়ত তুমিও গেছো ঘুমিয়ে; শুধু আমার দু'চোখে ঘুম আসে না, কেন ঘুম আসে না, বুঝি ঘুমের সে রাত গেছে ফুরিয়ে . . . । ওদিকে তোমার নাক ডাকার শব্দ তানপুরার কাজ করল। মনে হলো তুমি ঘুমিয়ে পড়েছিলে। সত্যি বল তো, তুমি কি ঘুমিয়ে পড়েছিলে?

আপনঘরে পরবাসী

দরজাটা খোলাই ছিল দোতলার এই ঘরের। একটা লোক পড়ল ঢুকে। ঘরে ঢুকেই সে ঘরে বসা লোকটাকে সোজা জিজ্ঞেস করে বসল–
– আপনি বুঝি এ বাড়ির গেস্ট?
খাবরের কাগজ থেকে মুখ তুললেন যোগীন্দ্রবাবু–
– আমাকে বলছেন?
যেন কত দিনের পুরনো চেনা-জানা এ বাসা, এমন ঢঙে সোফায় বসতে বসতে তাচ্ছিল্যের সুরে–
– এখানে তো একটিই মাত্র প্রাণী দেখতে পাচ্ছি? তো, কাকে আর বলতে যাবো?
একথায় কেমন ভ্যাবাচেকা খেয়ে যান যোগীন্দ্রবাবু। গোবেচারা স্বভাবের মানুষ তিনি। বরাবরই একটু লাজুক। কথা কম বলেন। ভাবেন বেশি। ভাবতে ভাবতে আসল কথাই যান ভুলে। ভদ্রলোক মাঝবয়সি। নদীর ভাঙনের মতো মাথায় টাকের আভাস। চুলে সাদা-কালো লুকোচুরি। জীবনে 'না' শব্দটির সাথে তিনি পরিচিত কম। কেউ কিছু বললে সেটাই মেনে নেন সহজে। ঝুট ঝামেলার ধারে কাছে নেই। এমনকি, মুখে মিষ্টি একটু হাসি ফুটিয়ে রাখেন যাতে মনে হয় তিনি সন্তুষ্টই হয়েছেন।
বৃষ্টির ভেতর একদিন গেছেন বাজারে। মুদির দোকানে ঢুকে কিনছেন তেল, নুন, হলুদ, মরিচ, ডাল। পাশেই ছাতাটা রেখেছেন দাঁড় করিয়ে। ছাতাটা হাতে নিয়ে এক লোক বললেন–
– এই দ্যাখো, ছাতাটা এখানে রেখে, আমি খুঁজে মরছি কোথায়? বলেই যোগীন্দ্রবাবুর দিকে তাকালেন–
– কী ভায়া, এটা আমার না?
ফ্যালফ্যাল করে যোগীন্দ্রবাবু কিছুক্ষণ তাকিয়েছিলেন ছাতাটার দিকে। লোকটার চোখের দিকে তাকিয়ে আর 'না' বলতে পারলেন না। কোনমতে বললেন–
– তাইতো! তাই তো!
ছাতাটা মুড়ি দিয়ে চলে গেলেন লোকটা। পিছন ফিরে দেখে, একটা দীর্ঘশ্বাস চেপে, বাজারের ব্যাগ নিয়ে যোগীন্দ্রবাবু ভিজতে ভিজতে ছুটলেন বাসার দিকে। এ রকম নানা ঘটনায় সমৃদ্ধ তার দিনকাল।
উত্তর না পেয়ে লোকটার আবার প্রশ্ন–
– কী, আপনি কি এ বাড়ির গেস্ট?
ঠোঁটে মৃদু একটু গান্ধীজীমার্কা হাসি ফোটাতে চেষ্টা করে যোগীন্দ্রবাবু বললেন–
– এই আর কী?
তারপর আবার মনোনিবেশ করেন খবরের কাগজে। এরই মধ্যে ঘরে এসে প্রবেশ করে শ্রীনাথ। শ্রীনাথকে দেখেই লোকটা– 'আররে দাদা, ক্যামন আছেন'? –বলে হাত দু'টো দিল বাড়িয়ে। দু'হাত প্রসারিত করে কোলাকুলি দিতে দিতে শ্রীনাথও বলল–
– আরে, এসে গ্যাছেন তাহলে? বসুন, বসুন।
খবরের কাগজ থেকে চোখটা সামান্য সরিয়ে পুরু লেন্সের চশমার ভেতর দিয়ে কোলাকুলিরত যুগলের প্রতি কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকলেন যোগীন্দ্রবাবু। গৌরাঙ্গ ভাব। দেখতে চাইলেন– দু'টো দেহের দূরত্ব কতটুকু, কিংবা কোন ফাঁক থাকল কিনা দু'দেহের ভেতর। তারপর দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে আবার চোখ রাখলেন কাগজে। সম্ভবত মনও। কারণ মন ও চোখ তিনি দু'জায়গায় রাখতে পারেন না।
উচ্ছল এ কথাবার্তা শুনে ওঘর থেকে বেরিয়ে এলেন সুধাময়ী। যোগীন্দ্রবাবুর স্ত্রী। সুধাময়ীকে দেখেই লোকটা নমস্কার দিয়ে বললেন–
– আরে আপনিইতো বৌদি? নমস্কার, নমস্কার।
সুধাময়ী বললেন–
– নমস্কার, হ্যাঁ ভাই, আমিই বৌদি।
– দাদা কিন্তু কক্খোনোই আপনার কথা বলেন নি। বলুন তো . . . ?

যেন তার শ্রীনাথের সাথে বহুদিনের আলাপ এমনভাবে বলে–
– এটা কিন্তু ঠিক হয় নি, মাইরি?
অনুযোগের সুরে সুধাময়ী নাকি স্বরে–
– উনি ওরকমই। কোনো কিছু নিয়েই কখনোই . . .
খবরের কাগজ থেকে চোখ সরিয়ে হাঁ করে দেখছেন যোগীন্দ্রবাবু। নাটক। জমছে বেশ। ভাবছেন– মন্দ নয় ব্যাপারটা। বেশ উপভোগ্য। ভ্রান্তিবিলাস আর কাকে বলে? একজন কিছু না জেনে, না বুঝেই বলছে– 'আপনিইতো বৌদি'? আর একজন কি বুঝেই উত্তর দিচ্ছে– 'হ্যাঁ, আমিই বৌদি'। তবুও এতটুকু মুখ খুললেন না যোগীন্দ্রবাবু। বললেন না কিছুই। এই তার স্বভাব।
– 'আপনারা বসুন, আমি চা করে আনছি'।
বলেই চলে গেলেন সুধাময়ী।
সুধাময়ী চলে যেতেই লোকটা বলে উঠল–
– তা ভাই বৌদিটি কিন্তু খাসা!
শ্রীনাথ– তা যা বলছেন ভাই।
যোগীন্দ্রবাবু ভাবলেন– এখানেও ভুল হলো। মানুষের এই একটা স্বভাব– প্রশ্ন শুনেই উত্তর দেবে। প্রশ্ন বুঝল কি বুঝল না; কিংবা উত্তর ঠিক কি বেঠিক হলো; তার ধার ধারে না। উত্তর একটা দেয়া চাই-ই। আর তাই ঘটে যত বিপত্তি। যোগীন্দ্রবাবু দেখলেন, শুনলেন, বুঝলেন; তবুও কিছু বললেন না। আবার চোখ রাখলেন কাগজে।
লোকটা– বাসাটা কিন্তু বড় চমৎকার দাদা।
শ্রীনাথ– সেতো বটেই, ভাড়াও তিনটি হাজার টাকা।
যোগীন্দ্রবাবু আবার চোখ তুলে ভাবলেন– আর একটা ভুল হলো। লোকটা নিশ্চই এটা শ্রীনাথের বাসা ঠাউরেছে। সুধাময়ীকে তাই শ্রীনাথের স্ত্রী ভেবেছে। বোকা শ্রীনাথ বিষয়টি বুঝতে পারে নি। যোগীন্দ্রবাবু বুঝেও কিছু বললেন না। আবার মন দিলেন কাগজে।
যোগীন্দ্রবাবুর দূর সম্পর্কের এক আত্মীয় শ্রীনাথ। ভবঘুরে। এসেছে বেশ কিছুদিন। বেড়াতে। যাবার নামটি নেই। যার সাথে যেখানে পরিচয় হয়, এ বাসার ঠিকানাটা দিয়ে বলে– 'আমার বাসার নম্বরটা লিখে নেন। যাবেন কিন্তু বেড়াতে'? আর অমনি মাঝে মধ্যেই ঝুট্ ঝামেলা ঘটে। এরকম দু'চারজন এসে হানা দেয়। যোগীন্দ্রবাবু কিছু বলতেও পারে না। নিজের ঘরে নিজেই অতিথি হয়ে বসে থাকেন।
সুধাময়ী চা হাতে হাজির। ওগুলো নামিয়ে রেখে চলে গেল। যোগীন্দ্রবাবু চা খান না। তাই দু'কাপ। ধূমায়িত কাপের দিকে দৃষ্টি দিয়ে আবার তা ফিরিয়ে নিলেন খবরের কাগজে। তৃতীয় পৃষ্ঠায় এক অখ্যাত জায়গায় ছোট্ট একটা খবর– 'গৃহস্বামীর আত্মহত্যা'। তিনি ভাবলেন– এত ছোট করে এ খবরটা এখানে ছেপেছে কেন? এর কি কোনোই মূল্য নেই। বরং এটি হতে পারত আজকের কাগজের 'হেডলাইন'। প্রথম পাতার প্রথম কলাম। ৪৫ পয়েন্ট এর বোল্ড অক্ষর। সবারই যাতে চোখে পড়ে প্রথম।
চায়ের পেয়ালা দু'টো শূন্য হলো। তা নিয়ে চলে গেল শ্রীনাথ। এ সময় জিজ্ঞেস করল লোকটা–
– এই যে, তা নামটা কী হে আপনার?
জলদমন্দ্রস্বরে গম্ভীর জবাব এল– 'যোগীন্দ্রনারায়ণ'।
– ও বাব্বা, তা নামটাতো দেখ্‌ছি খাসা-ই। বলতে দাঁত ভেঙে যায়। দেখতেও তো কিছুটা সে রকমই! তা কী করা হয়? নাকি বসে বসে অন্ন ধ্বংস?
– এই একটা . . .
যোগীন্দ্রবাবুর কথা শেষ হবার আগেই আবার প্রশ্ন–
– শ্রীনাথবাবু কী হয়?
– ভাই।
– তা দিব্যি তো দেখছি ভাইয়ের কাঁধে চেপে বসে আছেন?
– কে কার কাঁধে চাপে, তার ঠিক কী?

এরই মধ্যে শ্রীনাথ এসে পড়ায় কথায় ছেদ পড়ে।
শ্রীনাথের সাথে লোকটার প্রথম দেখা পথে। শ্রীনাথের দিকে পিট পিট তাকিয়ে মিট মিট হাসছিল। শ্রীনাথেরও বেশ হাসি পাচ্ছিল লোকটাকে দেখে। কাছাকাছি আসতেই একে অপরকে বলেই ফেলল–
– কী ভায়া?
এরপর কী করে যে আলাপ, তারপর পরিচয় এবং অন্তরঙ্গতা হয়ে গেল কিছুক্ষণের মধ্যেই। ব্যস্। দু'দিন যেতে না যেতেই লোকটি এসে হানা দিল বাসায়।
ভাব-গতিক দেখে মনে হয় না যে যাবার তেমন ইচ্ছে আছে তার। সুধাময়ী তাই চাল চাপিয়ে দিল উনুনে। ততক্ষণে সন্ধে হয়ে গেছে। ব্যালকনিতে এসে দাঁড়ালেন যোগীন্দ্রবাবু। কোথা থেকে যে এসব উটকো ঝামেলা এসে জোটে? এ সময় কাছে এসে লোকটা পাঁচটা টাকার একটা নোট দিয়ে যোগীন্দ্রবাবুকে বললেন–
– এই নিন, দোকান থেকে একটা বাংলা ফাইভ নিয়ে আসুন তো আমার জন্যে।
বুঝতে না পেরে যোগীন্দ্রবাবু বললেন–
– কী আনতে হবে?
একটু ধমকের সুরে লোকটা বললেন–
– বাংলা কথা বোঝেন না? বাংলা ফাইভ সিগারেট আনবেন একটা দোকান থেকে।
সিগারেট খাওয়া এবং সিগারেট খাওয়া লোকদের একদম পছন্দ করেন না যোগীন্দ্রবাবু। তাই বললেন–
– আমি যাবো? সিগারেট আনতে?
– তাহলে আর কে যাবে? আর কাউকে তো দেখছি না এখানে?
যোগীন্দ্রবাবু প্রতিবাদী হয়ে উঠলেন–
– কক্খোনোও না। দরকার হলে আপনি নিজেই গিয়ে নিয়ে আসুন আপনার সিগারেট।
কথাটা বলেই মনে হলো– একটু রূঢ় স্বরে বলা হয়ে গেল। এতটা কড়া কথা না বললেও পারতেন। মনটা দমে গেল। অগ্যতা বলে বসলেন–
– আচ্ছা দেন, আমিই না হয় নিয়ে আসছি। কিন্তু আর কক্খোনো না। এই প্রথম। আর এই-ই শেষ। বলে দ্রুত পায়ে নিচে নেমে গেলেন টাকাটা নিয়ে। সিগারেট এনে লোকটার হাতে দিলেন।
দু'ঠোটের মাঝখানে সিগারেটটা ঢুকিয়ে আয়েশ করে বলল–
– একটা ম্যাচ।
– ম্যাচ নেই এ বাসায়। রাগত উত্তর।
– তাহলে চলবে কী করে? একটু ধরিয়ে এনে দিনতো উনুন থেকে। দু'টো সুখটান দেই? সিগারেট হচ্ছে সুখদণ্ড, বুঝলেন। মাঝে মাঝে না খেলে শরীরটা চাঙা লাগে না। দু'টান দেবেন, শরীর-মন ঝরঝরে। নেন। ধরিয়ে নিয়ে আসুন। এত আলসেমি করলে বসে বসে পাছায় শেকড় গজিয়ে যাবে।
লোকটার চোখের দিকে তাকিয়ে, কিছুটা ঘৃণা ছিটিয়ে দিয়ে, সিগারেটটা নিয়ে চলে গেলেন যোগীন্দ্রবাবু রান্না ঘরের দিকে। ধরিয়ে এনে দিলেন। ততক্ষণে ফিরে এসেছে শ্রীনাথ। বিকেলের বাজারে গিয়েছিল সুধাময়ীর ফরমায়েশে। হাতে বাজার ভর্তি থলে। শ্রীনাথকে দেখেই এক মুখ ধোঁয়া ছেড়ে বলল–
– তা ভাই, আপনি না গিয়ে এই লোকটাকে পাঠাতে পারেন না বাজারে? বলে যোগীন্দ্রবাবুকে দেখাল।
শ্রীনাথ বলল– আরে না না। এ আর কী এমন?
রাতের খাওয়া শেষ হলে বিরাট একটা ঢেঁকুর তুলে চৌকির উপর উঠে হাঁটু মুড়ে বসে পড়ল লোকটা। এরপর একটু কাৎ হয়ে গড়িয়ে দিল গা। কিছুক্ষণ বাদেই স্টার্ট দিল টেম্পু। শুরু হলো নাকডাকা। অর্থাৎ কুম্ভকর্ণের ঘুম। সুখনিদ্রা।
দু'তলার দু'রুমের এ বাসা। একটা মাত্র বেডরুম। চৌকিও একটা। স্বামী-স্ত্রীর ছোট সংসার। ছেলেপুলে নেই। গেস্টরুমে একটা সোফা সেট আর একটা টি টেবিল। শুতে হলে মেঝেতে। শ্রীনাথ অবশ্য সোফাতেই রাত কাটিয়ে দেয় কোনোমতে। যোগীন্দ্রবাবু বুঝলেন– ঘুমটাও মাটি। এ কুম্ভকর্ণ জাগবে না। ওদিকে সোফায় কাৎ হয়ে গেছে শ্রীনাথ। কী করবেন ভেবে না পেয়ে এসে দাঁড়ালেন ব্যালকনিতে। বাইরে নবমীর চাঁদ। আকাশে এলোপাথাড়ি বৃষ্টিহীন মেঘ। কোথা থেকে নিশিজাগা এক ফুলের গন্ধ আসছে ভেসে। হাসনাহেনা

অথবা শিউলি আছে ধারে-কাছে কোন বাড়িতে হয়ত। কিন্তু সবই অসহ্য লাগছে তার কাছে। 'ধ্যাৎ ছাতা' বলে চলে এলেন ছাদে। হাতে করে নিয়ে এলেন এক পুরনো কাগজ। সেটা বিছিয়ে আকাশের দিকে মুখ করে চিৎ হয়ে পড়লেন শুয়ে। রাগ কমানোর জন্য এক দুই করে শুরু করলেন তারা গোনা। রান্নাঘর সামলে ঘরে এল সুধাময়ী। স্বামীকে দেখতে পেল না। দেখল লোকটা তাদের বিছানায় শোয়া। ভারিক্কি চালে ডাকছে নাক। গেস্টরুমে এসে দেখে শ্রীনাথ কাৎ হয়ে আছে সোফায়। ব্যালকনিতে এল। নেই। খুঁজল। কোথাও নেই। বুঝতে অসুবিধে হল না কী ঘটেছে। তাই চলে এল ছাদে।

মাথার কাছে এসে বসল। মাথায় হাত রাখল। আঙুল দিয়ে চুলে বিলি কাটতে কাটতে বলল–

– এভাবে কি চলে? তুমি কেন কিছু বলো না কাউকে? বালিশ ছাড়া শুধু মাথায় কি শোয়া যায়? কী শক্ত ছাদ! নাও, মাথাটা উঠিয়ে আমার কোলে রেখে শোও।

– ছাদটা শক্ত বলেই এখানে এসে কেউ হানা দেয় নি। নয়ত এখানেও আশ্রয় মিলত না আমার।

রাত শেষ প্রায়। পুব দিক ফর্সা হয়ে উঠবে একটু পরেই। পৃথিবী ঘুমায়। নিজের নাক ডাকার শব্দে নিজেই চমকে উঠল লোকটা। বলে উঠল– 'কে? কে'? ধড়ফড় করে উঠে বসল। তারপর চোখ মেলে তাকাল চারিদিক। না। কেউ নেই কোথাও। তার খেয়াল হলো সে কোথায়। ভাবল– চৌকিতে ঘুমুনো তার ভুল হয়ে গেছে। দাদা-বৌদি নিশ্চই মাটিতে শুয়েছে ও ঘরে? কাজটা খুব অন্যায় হয়ে গেছে। তাড়াতাড়ি উঠে চলে এল গেস্টরুমে। দেখে– দাদা সোফায় চিৎপটাং। বৌদি উধাও। নেই। ভাবল– ব্যাপারটা কী? তাহলে বৌদি কোথায়? হঠাৎ খেয়াল হলো– সেই যজ্ঞেশ্বর নারায়ণ না পরমেশ্বর নারায়ণ না কী নামের লোকটাওতো নেই? দু'জনই লাপাত্তা! ব্যাপার কী? পদশব্দ না করে এদিক-ওদিক-সেদিক খুঁজল। না। নেই। কোথাও নেই। হাওয়া। ব্যালকনিতে নেই। অবশেষে বাথরুমে। সেখানেও নেই। ভোজবাজি। বুঝতে দেরি হলো না– এজন্যই পরমেশ্বর লোকটা এ বাড়িতে থাকে। ডুবে ডুবে জল খায়। শ্রীনাথদা ভালো মানুষ বলেই কিছু বোঝে না। সন্দেহও করে না। তা খাক্ ডুবে ডুবে জল। কিন্তু গেল কোথায়? চট্ করে মাথায় এক বুদ্ধি এল– ছাদেওতো যেতে পারে? দ্রুত ছাদের সিঁড়ি ধরল। মাথাটা ছাদের সমতল থেকে সামান্য একটু জাগিয়ে তাকাল। যা দেখল, তাতে তার কান ঝাঁ ঝাঁ করে উঠল। ইস্! বৌদির কোলে মাথা দিয়ে আরামে শুয়ে আছে। পরমেশ্বর। বৌদি যেন কী বলছে। ছাদের মাঝখানে শোয়াতে স্পষ্ট শোনা যাচ্ছে না কথাগুলো। খরগোশের মতো সজাগ রাখল কান। না। শোনা যাচ্ছে। তবে বোঝা যাচ্ছে না। এ দৃশ্য দেখা যায় না। অসহ্য। বাংলা সিনেমাও ফেল মেরেছে। গোবেচারা নিরীহ প্রকৃতির লোকটা নিচে সোফায় ঘুমুচ্ছে। আর বউ কিনা টাংকি মারছে পরপুরুষের সাথে। ছিঃ ছিঃ। পৃথিবীটা কি গোল্লায় গেল?

তরতর করে নেমে এল নিচে। দাদাকে জাগিয়ে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিতে হবে। এতটুকু উপকার করবে না– এমন নেমকহারাম সে নয়। কিন্তু কী করে সে বলবে এ কথা? কী করে দেখাবে এ দৃশ্য? না। কোনোভাবেই সে পারবে না। স্থির করল– এখনই চলে যাবে সে এ বাসা থেকে। ভোর হতেও বিশেষ বাকি নেই। চলে যাবে সে এক্ষুণি। কাউকে কিছু না বলে। এ পৃথিবী এমনই থাক। সেই গানটাও তার মনে পড়ল– লঞ্চে একটা অন্ধ ছেলে গেয়ে ভিক্ষে করছিল সেদিন পদ্মায়– আরিচা পার হবার সময়– 'এই পৃথিবী যেমনি আছে তেমনি পড়ে রবে; সুন্দর পৃথিবী ছেড়ে একদিন চলে যেতে হব'। সে চলেই যাবে। গোপনে। তবু সে বলতে পারবে না কিচ্ছু।

ঘুম ভেঙে গেছে শ্রীনাথের। হঠাৎ তার খেয়াল হলো আগন্তুক লোকটার কথা। কোথায় শুয়েছে কে জানে। উঠে পড়ল। পাশের ঘরে উঁকি। সে নেই। দাদা-বৌদিও নেই। বাথরুমে উঁকি। নেই। ছাদে উঁকি। দাদা-বৌদি শোয়া। গরম বলেই হয়ত ছাদে। তাহলে লোকটা কোথায়? চুরি করে পালাল নাকি? একদিনের মাত্র পরিচয়। তা-ও পথের। এভাবে ঠিকানা দিয়ে নিমন্ত্রণ করা ঠিক হয় নি। চোর না ডাকাত তার ঠিক কী? ব্যাটা বোধ হয় চুরি করেই পালিয়েছে? সিঁড়ি বেয়ে শ্রীনাথ নিচে নামছে দ্রুত। চোর ব্যাটাকে পাকড়াও করতে হবে।

গেটে তালা। লোকটা বেরুতে পারে নি। তাই আবার ফিরছিল উপরে। শ্লথ গতি। আর শ্রীনাথও নামছে নিচে। চোখে চোখ পড়ল দু'জনার। থমকে গেল দু'জন যার যার স্থানে ভি.সি.পি.তে আটকে যাওয়া ফিল্মের মতো। লোকটা লজ্জায় চোখ নামিয়ে নিল। শ্রীনাথের কণ্ঠ শোনা গেল বিল্ডিং কাঁপিয়ে– তবে রে শালা–

বাদশার মা

– স্যার, কুররার মাংসে কি আলু দিমু?
– দাও।
– কী আলু দিমু? মিডা আলু, না গোলালু?
– মাংসে মিষ্টি আলু দেয় নাকি কেউ? গোল আলু।
– কয়ডা দিমু? চাইরডা দিমু, না পাঁচটা দিমু?
– দাও যে কয়টা ইচ্ছা। পাঁচটাই দাও।
– পুরান আলু, না নতুন আলু দিমু?
– নতুন আলু দেও।
– ছুইলা দিমু, না আছোলা দিমু?
– ছুলেই দেও।
– ছোড আলু দিমু, না বড় আলু দিমু?
– দাও, বড় দেখেই দাও।
– এক একটা আলু কয় টুকরা করুম, দুই টুকরা, না চাইর টুকরা?
– করো তোমার ইচ্ছামতো। চার টুকরাই করো।
– স্যার, আলু কি গোলগোলভাবে টুক্‌রা করুম, না লম্বালম্বিভাবে টুক্‌রা করুম?
– করো তোমার ইচ্ছেমতো।
– হ, হেইডা হরি, হেয়ার পরে মোরে ছিল্ল্যা লবণ লাগান আর কি? আপনেগো চেনা আছে?

সকালবেলা বাজার করে দিয়ে মুনির গেল স্নানে। মুরগি এনেছে। দুপুরে মাংস হবে। ছুটির দিন। পোলাও আর ঝাল মাংস। নীরেন শেভ করছে। আখতার চুলে কলপ লাগাচ্ছে। আমি টেবিলে বসে লিখছিলাম নিমগ্নভাবে। লেখার দিকে মন থাকায় এতক্ষণ খেয়ালই করি নি বাদশার মা কী সব বকর বকর করে যাচ্ছে। আমি শুধু হুঁ হাঁ করে যাচ্ছিলাম। শেষ কথাটায় সংবিৎ এল। এবার আমার মাথা গরম হওয়ার পালা। বললাম– এসব কী হচ্ছে? এখান থেকে বিদেয় হও এখন। তোমার যা ইচ্ছে, যে ভাবে ইচ্ছে রান্না করো গিয়ে, যাও। আমাকে আর বিরক্ত করো না। আঁচলটা কোমরে পেঁচিয়ে গজগজ করতে করতে চলে গেল ঘসেটি বেগমের মতো।

বাদশার মা'র মেয়ের মেয়ে কেন যে আমাকে মামা বলে, তার ইতিহাস জানা নেই। বাদশার মাকে বুয়া বলে ডাকি। সাথে নাতিন পিউকে নিয়ে তার আসা চাই-ই। এই হচ্ছে আর একটা মূর্তিমান জঞ্জাল। যন্ত্রণার একশেষ। পাঁচ/ছয় বছরের বাচ্চাটা যেন এফ. এম. রেডিও। সারাদিন কটর কটর করতেই থাকে। কান ঝালাপালা হয়ে যায়। কত কথা যে তার পেটে জমা, কে জানে? এই যেমন পুকুরে ডুব দিয়ে উঠলাম, ও বলে উঠল– মামা, আমি ভাবছি আপনে ডুইব্যা মরলেন। খেতে বসে মাংসের হাড় কিংবা মাছের কাঁটা চিবুচ্ছি ও বলে উঠছে– মামা, আপনেরে বিড়ালের মতো লাগছে। আপনে বিড়ালের চাইতে ভালো চাবান। পুকুর থেকে স্নান সেরে উঠে স্পঞ্জের স্যান্ডেল পায়ে দিয়ে বাসার দিকে হেঁটে আসছি। ভিজা স্যান্ডেলে কচ্‌ কচ্‌ শব্দ হচ্ছে। পিউ বলে উঠল– মামা, আপনার স্যান্ডেলে পাদে? ধৈর্য ঠিক রাখা দায়। অতটুকুন বাচ্চা, থাপ্পর মারাও যায় না। বকাও যায় না। হাসিমুখে হজম করতে হয়।

বাদশার মা'র রান্না একবার যে খাবে জীবনে কখনও সে তা ভুলতে পারবে না। মরণেও না। কবরে গিয়েও মনে পড়বে। ঢেঁকুর তুলবে। খোদার কসম, কবরে গিয়েও বমি আসবে। এত বিস্বাদ কী করে মানুষ রান্না করে তা বোঝার উপায় নেই। মাছ মসলা তরকারি কারো সাথে কারো কোনো সদ্ভাব নেই। সম্বন্ধ নেই। চির শত্রুতা। একই গামলার জলের মধ্যে যে যার মতো থাকে। সাঁতার কাটে। লবণ কখনও কম, কখনও এত বেশি যে মুখ জ্বলতে থাকে। কখনও ঝালে কানে তালা লাগে। কখনও হলুদে তরকারি রক্তগঙ্গা। আমরা কেউই প্লেটে মাখানো খাবার পুরোটা শেষ করতে পারি নি একদিনও। খেতে খেতে এক পর্যায়ে রাগ করে

থালায় জল দিয়ে উঠে পড়তে হয়। আর বুয়াকে চলে ধমকিধামকি। চিৎকার চেঁচামেচি। সেদিনও একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি। খাবার রেডি। সিং মাছ দিয়ে কাঁচকলার তরকারি। এত খারাপ হয়েছে রান্না যে কেউ কোনো কথা না বলে থালায় জল দিয়ে উঠে গেলাম। বকুনিও এল না মুখে। কলপারে গিয়ে চুপচাপ যে যার হাত ধুয়ে সোফায় গিয়ে বসে পড়লাম। কারও মুখে কোনো কথা নেই। যেন শ্রাদ্ধের বাড়ি। শোকদিবস। এক মিনিট নীরবতা পালন। এক মিনিট নয় অনন্তকাল। বুয়া এসে বলে–

– স্যার, রান্ধন আইজ খুব খারাপ অইছে, না?

যেন বোমা ফাটল। এতক্ষণে রাগটা ফোয়ারার মতো ফিনকি দিয়ে বেরুল সবার।

– যা রান্না কর, মানুষ কি তা খেতে পারে? অখাদ্য। ঘোড়ায় খাওয়ারও অযোগ্য।

– হ। আইজগার রান্ধনডা এট্টু খারাপই অইছে। কাঁচকলার তরকারিতে ভুলে আদা দিয়া ফেলাইছিলাম।

– কবে তোমার রান্না ভালো হয়েছে? বলোতো? এই সেদিনও তুমি গরম মসলা দিয়ে লালশাখ ভাজি করেছ। পিঁয়াজ রসুন আদা দারুচিনি লবঙ্গ এলাচ গোলমরিচ সবই দিয়েছ লালশাখ ভাজিতে। অখাদ্য।

– হ, আপনেগো মুহে নাই রুচি, অহোন দোষ অইছে রান্ধনের? প্যাটে নাই হোশ্, ভাত বেনুনের দোষ। অত খারাপ আমি রান্দি না। তয় মাজে-মধ্যেতো খারাপ অইতেই পারে? আতের পাঁচটা আঙুল কি সমান অয়?

– তোমার সব আঙুলই সমান।

– হেইডা কী কন? মোরে চেনন আপনেরা? আনসার আলির হৌডাল প্যারাডাইতে তিন মাস কাম করছি না? হগলেই কত পেরশংসা করছে? কইতো, এত সোন্দর রান্ধো ক্যামনে?

এক সকালে আমরা বসে আড্ডা দিচ্ছিলাম। শিক্ষা, সমাজ, সংস্কৃতি, সন্ত্রাস, রাজনীতি কোনোটাই বাদ নেই। আখতার চায়ে চুমুক দিচ্ছে আর পেপার পড়ছে। নীরেন যথারীতি শেভ করছিল। গালভর্তি ফেনা। পত্রিকায় খবর বেরিয়েছে 'শহরে পিস্তলসহ ছিনতাইকারী ধরা পড়েছে'। বাদশার মা'র ছেলে বাদশাও নাকি ওইসব করে বেড়ায়। পাড়ার মস্তান। কবে জেলে যায় কে জানে। সেসব নিয়ে কথা হচ্ছিল। এমন সময় বাদশার মা এসে বলল– 'স্যার, এট্টা পিস্তল লাগবে'। আমরাতো বিস্মিত। বলে কী? পিস্তল দিয়ে কী করবে বেটি? ছেলেকে দেবে নাকি? মুনির জিজ্ঞাস করল–

– পিস্তল?

– হ। পিস্তল।

– কী জন্যে? কী করবা পিস্তল দিয়া?

– স্যার লাগবে। হগল কতা কি কওন যায় আপনেগো?

– কেন বলা যাবে না? কী সমস্যা?

– স্যার, ইম্পট্যান্ট কাজে লাগবে।

– আশ্চর্য! কেন লাগবে সেটা বলবে তো?

– সিক্রেট বিষয়।

– মানে?

– স্যার, বাথরুমে লাগবে।

– বাথরুমে পিস্তল লাগবে? ক্যান?

– বাথরুম পরিষ্কার করতে পিস্তল লাগবে না? আপনেরা যা কন না? আখতার স্যার চা খাইতেছেন, এ সময় বাথরুম পরিষ্কারের কতা কওয়ন যায়?

– পিস্তল দিয়ে বাথরুম পরিষ্কার করে কীভাবে?

– ওডা বাথরুমে ঢাইল্যাই তো পরিষ্কার করতে অয়।

পিস্তল বাথরুমে ঢেলে কীভাবে বাথরুম পরিষ্কার করে বোঝা গেল না। কেউই কিছু বুঝতে পারছি না। আমরা অথৈ জলে হাবুডুবু খাচ্ছি। কোনো কিনার করতে পারছি না। আখতার বিষয়টা ধরতে পেরেছে। বলল–

– ফিক্সল? বাথরুম পরিষ্কার করার ফিক্সলের কথা বলছো?

– আজ্ঞে হয়। মোর উচ্চারোন অয় না ঠিকমতো। মুই কি কলেজে পড়ছি? এম.এ. বি.এ. পাস দিছি? মোর কতায় অত দোষ ধরেন ক্যান? রঙ্গ পাইছেন?

নীরেন গালে রক্ত মেখে এসে হাজির। সাদা ফেনা এখন লাল। হাতে রেজর। সে এক অদ্ভুত দৃশ্য। বাদশার মা'র উপর চটে গিয়ে–
– দ্যাখো তুমি কী করেছো?
– ওমা, কী কাণ্ড, গাল কাটল ক্যামনে স্যার?
– তুমি। তোমার জন্যে।
– ওমা, মুই আবার কী হরলাম? মুইতো এইহানে স্যারেগো লগে পিস্তল নিয়া কতা কইছিলাম?
– সেই তো সর্বনাশ করেছো। তোমার পিস্তল লাগবে শুনেইতো আমার হাতটা কেঁপে উঠল। হ্যাঁচকা টানে গালটা কাটল। কথা বলার আর সময় পেলে না? পিস্তল লাগবে? কী সব কথা? গা টা আমার ঝাঁকুনি দিয়ে উঠল। আমি যেন কেমন হয়ে গেলাম।
গজ্‌গজ্ করতে করতে নীরেন চলে গেল স্যাভলনের খোঁজে। আমরা হো হো হাসতে লাগলাম। আখতারের কাছ থেকে টাকা নিয়ে বাদশার মা চলে গেল বাজারের দিকে 'পিস্তল' কিনতে। আমরা ভাবছিলাম, বাজারে গিয়ে আবার কী কাণ্ড ঘটায় বাদশার মা কে জানে?
বাদশার মা গেল তো গেল। অগস্ত্য যাত্রা। ফেরার কোনো নামগন্ধ নেই। রান্নার সময় পেরিয়ে যায়। অফিসের সময় হলো বলে। নিখোঁজ। আমরা উত্তেজিত। উদ্বিগ্ন। পাশের বাসার বুয়ার কাছে খবর পাওয়া গেল বাদশার মা অ্যারেস্ট হয়েছে। কাকটিও উড়ল, তালটিও পড়ল। বাদশাকে সকালে পুলিশ অ্যারেস্ট করেছে। সে খবর পাওয়ার আগেই বাদশার মা এক দোকানে গিয়ে জিজ্ঞেস করেছে– পিস্তল আছে? সে কথা শুনে একজন তাড়াতাড়ি ছুটে গিয়ে পুলিশকে খবর দেয়। পুলিশ অকুস্থানে এসে বাদশার মাকে পায়। ধরে নিয়ে যায় থানায়। তারা দুইয়ে দুইয়ে চার মিলায়। বাদশার সন্ত্রাসের সাথে তার মা'র যোগসূত্র আবিষ্কার করে। পুলিশ চক্রান্তের গন্ধ পেয়ে বাদশার মাকেও আটক করে। বাদশার মা যতই বলে বাথরুম ধোয়ার জন্যে সে পিস্তল কিনতে এসেছে, পুলিশ বিশ্বাস করে না কথা। পিস্তল দিয়ে বাথরুম ধোয় কী করে? এসব আজগুবি কথা তাদের যথেষ্ট শোনা আছে। ধরা পড়লে দাগি আসামিরা এ ধরনের উল্টোপাল্টা কথা বলে। পাগলের মতো আচরণ করে। বোকা সাজে। পুলিশকে ধোঁকা দিতে চেষ্টা করে। বাংলাদেশের পুলিশ অত বলদ না।
বাদশার আব্বা বাড়ি ছিল না। বাদশার জন্যে মেয়ে দেখতে গেছে পাশের গ্রামে। মেয়ে পছন্দ হয়েছে। গা-গতরে লাগসই। ছেলে গোল্লায় যাক ভেবে আব্বা নিজেই বিয়ে করে পরদিন বাড়ি এসে হাজির। ঘরে ফিরে গৃহযুদ্ধের সমূহ সম্ভাবনার কথা চিন্তা করে নানা রকম ফন্দি ফিকির তৈরি করে রেখেছে। বাদশা আর তার মাকে সামলাতে হবে তো? বিয়েটা যে না করে উপায় ছিল না, যুক্তি দিয়ে তা বুঝাতে হবে। কী কী বলবে, সে সব ঠিক করে গুছিয়ে রেখেছে। কিন্তু সে সব বাক্যবাণ বর্ষণ করা গেল না। এসে দেখে ঘর খাঁ খাঁ। মরুভূমি। মেঘ না চাইতেই পানি। স্ত্রী-পুত্র অনুপস্থিত। খোঁজ-খবর নিয়ে জানল মা-বেটা জেলে। প্রমাদ গণার বদলে প্রফুল্ল হলো মন। ভাবল, খোদা যা করে মঙ্গলের জন্যই করে। মর্জিনার বাপ, একেবারে খাপে খাপ। বাদশার বাপ ভাবল– মা-বেটা থাক কিছুদিন শ্রীঘরে। ততদিনে গুছিয়ে নেয়া যাবে নতুন সংসার।
কিন্তু, কেত্তন যা লাগল মদন, বাদশাকে না ছাড়লেও বাদশার মাকে বিকেলেই ছেড়ে দিল পুলিশ আমাদের অনুরোধে। আমরা ঘরের ছেলে ঘরে ফিরলাম। বাদশার মা তার ডেরায়। ঘণ্টাখানেকের মাথায় পাড়া মাথায় করে বাদশার মা এসে হাজির আমাদের বাসায়। কান্না বা আছাড়ি-পাছাড়ি কোনোটাতেই কম যায় না। কমেও না। উত্তরোত্তর বাড়ে। পাল্লা দিয়ে চলে চিৎকার এবং হাত-পা ছোঁড়াছুঁড়ি। যে সব শব্দ নির্গত তার মুখ থেকে তার মর্ম বা অর্থ টোলের কোনো সংস্কৃত পণ্ডিতও উদ্ধার করতে পারবে না। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনার চেষ্টা চলছে। কিন্তু নিয়ন্ত্রণে আসছে না। দমকল বাহিনীর দরকার। আমরা ভাবলাম, বাদশার মা বোধ হয় বিধবা হয়েছে। বাদশার আব্বা ইন্তেকাল ফরমাইছে (ইন্নালিল্লাহি ওয়ানেইল্লাহি . . . রাজিউন)। স্বামীশোক বলে কথা। সান্ত্বনা দিতে চেষ্টা করলে বাদশার মা বলে ওঠে–
– হোনছো, কয় কী? বাদশার আব্বায় বোলে মারা গ্যাছে? ক্যাডায় কয় এ কতা? তাইলে কি মুই কান্দি? কান্দি ব্যতায়। পরানডা পুইর‍্যা খাক অইয়া গ্যালো। বাদশার আব্বায় নতুন সংসার করছে। পোলায় জেলে। বাপে সাদি কইর‍্যা ফিরছে মোর সতিন লইয়া। কপালে এই ছিলো মোর?

এতক্ষণে পরিষ্কার হলো কাহিনি। এ ক্ষেত্রে কী করার আছে আমাদের, তা বুঝে উঠতে পারছি না। অগত্যা মৌন ব্রত। আর বাদশার মা'র ঠিক ততোধিক জোরে চিৎকার। বোঝা গেল, স্বামীর মৃত্যু শোকের চেয়ে স্বামীর বিয়ের শোকের তীব্রতা বেশি। এখন ভাবনা, বাদশার মা অজ্ঞান হয়ে না যায়। তাগড়াই শরীরে শাড়ির শৈথিল্য বেমানান। এ মুহূর্তে অজ্ঞান হয়ে গেলে পাড়ার লোকের কাছে বিষয়টা দৃষ্টিকটূ হয়ে যাবে। মান-সম্মান নিয়ে টানাটানি। তার চিৎকারে কানে তালা লাগে। কী করা যায়? মুনিরের মাথায় চমৎকার একটা বুদ্ধি এল। জোরে ঘোষণা করল–

– বুয়া, এইমাত্র খবর পেলাম বাদশার আব্বা মারা গেছে।

মুহূর্তে চিৎকার বন্ধ। কোরামিনে কাজ হলো। দমকা ঝড়ের মতো হঠাৎ পরিস্থিতি নিস্তব্ধ।

– কন কী? বাদশার আব্বা ইন্তেকাল ফরমাইছে?

– হ্যাঁ, মারা গেছে। এইমাত্র খবর পেলাম।

– ক্যামনে মরল?

– আত্মহত্যা করেছে। নতুন বউয়ের জ্বালায়।

– এক্কেবারে ঠিক অইছে। যাই, লাথি দিয়া বাইর কইর‍্যা দিয়া আসি গতরখাগি মাগিরে। মোরে জ্বালাইতে আইছে? দ্যাখ ক্যাডায় জ্বলে?

সহসা বন্ধ হলো চিৎকার। ঝড়ের বেগে বের হয়ে চলে গেল মাতঙ্গিনী। আমরা শঙ্কিত, না জানি কী ঘটায় গিয়ে বাড়িতে? খুনোখুনি না হয়। রুদ্ধশ্বাসে অপেক্ষা করা ছাড়া আর উপায় কী?

শেফালি

তার প্রথম প্রশ্নটাই ছিল (ধমকের মতো করে)– হিন্দু? না মোসল্‌মান?
বাসে উঠেই পার্শ্বযাত্রীকে কি কেউ হঠাৎ এরকম প্রশ্ন করে? আমার পাশের সিটে বসতে বসতে পঞ্চাশোর্ধ স্থূলাকায় এক মহিলা আমাকে এ প্রশ্ন করে বসল। খেই হারিয়ে ফেললাম। কী উত্তর দেব বুঝে উঠতে পারছিলাম না। কিংকর্তব্যবিমূঢ় যাকে বলে। তার দিকে অপলক তাকিয়ে আছি আমি।
আবার প্রশ্ন– হিন্দু? না মোসল্‌মান?
বললাম– হিন্দু।
এবার বিস্ময়ান্বিত প্রশ্ন– হিন্দু?
বিস্ময় এবং সংশয় মেশানো প্রশ্ন। এ প্রশ্নের কোনো উত্তর হতে পারে না। পরের প্রশ্ন– বিয়া অইছে?
সম্মতিসূচক মাথা ঝাঁকালাম। আবার একই প্রশ্ন বিস্ময় এবং সংশয় মেশানো– বিয়া অইছে? কপাল থেকে সিঁথি পর্যন্ত দৃষ্টির বাণ নিক্ষেপ। আবার মাথা ঝাঁকালাম। খপ্‌ করে তার ডান হাত দিয়ে আমার বাঁ হাতের কব্জিটা ধরে ফেললেন। দ্রুত নেড়েচেড়ে দেখে ভূত দেখার মতো চমকে উঠে বললেন– এ কী, শাঁখা কই? চুড়ি কই? শাঁখা-চুড়ি কিছছু নাই? কপালে সিঁদুর নাই! হাজব্যান্ড মারা গ্যাছে? বিধবা?
– না। আমার হাজব্যান্ড পছন্দ করে না।
– হাজব্যান্ড মোসল্‌মান?
এ প্রশ্নের জবাব দেয়া আর প্রয়োজন মনে হলো না। বিব্রত হচ্ছিলাম। চুপ করে থাকলাম।
আবার প্রশ্ন– কী নাম? হাজব্যান্ডের কী নাম?
– পল্লব চৌহান।
কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকলেন। সন্দেহ, সংশয়। বুঝতে চেষ্টা করলেন হিন্দু না মুসলমান। ভ্রূ কুঞ্চিত। অস্পষ্ট উচ্চারণ করলেন– বুঝলাম না। নারায়ণ না, বিষ্ণু না– পল্লব? এইডা কোনো নাম অইলো?
আবার প্রশ্ন– হাজব্যান্ড কী করে?
– তোলারাম কলেজের প্রফেসর।
– ও বাবা, তয় তো ভালো চাকরি? তুমি কী করো?
– আমিও ঢাকার একটা কলেজে পড়াই।
– তাই নাকি? কী নাম তুমার?
– তৃষা।
– কোথায় থাকো?
– ঢাকায়।
– এখন কোথায় যাবা?
– নারায়ণগঞ্জ।
– থাকবা কোথায়?
– থাকব না। ঢাকা ফিরব।
– কও কী? এত রাইতে যাবা কীভাবে? নারায়ণগঞ্জে কার কাছে যাবা? ক্যাডা আছে?
– অনেকেই আছে। আমার মাসি আছে।
– কী নাম?
– লক্ষ্মী চক্রবর্তী।
– কও কী? (যেন লাফ দিয়ে উঠলেন) লক্ষ্মীদি তোমার মাসি? লক্ষ্মীদি আমাকে দেখলেই জড়ায়ে ধরে কান্দে। আহা লক্ষ্মীদির কী কষ্ট! একটামাত্র পোলা। রাজপুত্তুরের মতো চেহারা। কলেজে পড়ত। নিখোঁজ অইয়া গেল। আর ফিরল না। তার দিকে তাকানো যায় না। তয় কী জন্যে নারায়ণগঞ্জ যাবা তুমি?
– রিহার্সেল আছে।

– কীসের, নাটকের? তুমি নাটক করো?
– না। গানের। শাস্ত্রীয় সংগীতের অনুষ্ঠান আছে। উদ্বোধনী সংগীতের রিহার্সেল।
– হেইডা আবার কী?
– ক্ল্যাসিক্যাল মিউজিক। খেয়াল ঠুংরি এইসব।
– ও বুজছি, আ আ আ আ করে। তাই না?
– হ্যাঁ। তবে শুধু কণ্ঠ না, যন্ত্রসংগীতও আছে।
– তাই নাকি? কুন্ হানে অবে?
– নারায়ণগঞ্জ ক্লাবে। কনভেনশন হলে। আসবেন।
বলে ব্যাগ থেকে একটা কার্ড বের করে দিলাম। ছোঁ মেরে নিয়ে খামটা খুললেন। তার হাতে একটা ক্যালেন্ডার ছিল। সেটা আমার হাতে গছিয়ে দিয়ে কার্ডটা বের করলেন। তারপর ব্যাগ খুললেন। হাতড়ে চশমা বের করলেন। শাড়িতে মুছলেন। চোখে পরলেন। মনোযোগ দিয়ে লেখাটা পড়লেন। চোখে তীর্যক দৃষ্টি হেনে জিজ্ঞেস করলেন–
– কাসেম জামাল আসবে? কাসেম জামাল তো ক্লাবের সভাপতি নাই? বর্তমান সভাপতি আসবে না? আইভি আসবে না, আইভি? মেয়র?
– আসবে।
– ডি.সি. এস.পি. আসবে না?
– আসবে।
– কার্ডে নাম দ্যাও নাই ক্যান?
– যারা পারফর্ম করবে, শুধু তাদেরই নাম দেয়া হয়েছে।
– এইডা কোন্ নিয়ম?
– তাঁরা সবাই নিমন্ত্রিত দর্শক-শ্রোতা। দর্শক-শ্রোতার নাম দেই না আমরা।
– ও আইচ্ছা, বুজছি। যামুনে। আরও তিন চাইর জনরে লইয়া যামুনে। এক কার্ডে তিনজনরে ঢুকতে দিবা তো? দেইখো, এক কার্ডে তিনজনরে ঢুকতে না দিলে কিন্তু তোমারে ডাক দিবানি। বুঝই তো, মান-সম্মানের ব্যাপার? অপমান তো সহ্য হবে না। আইচ্ছা, খাওন রাইত দ্যাট্টায় দিবা ক্যান? রাইত দশটা অইলো গিয়া পারফেক্ট টাইম।
– যারা সারারাত জাগবে, তাদের জন্য ওই সময়টাতেই রাতের খাবারের ব্যবস্থা।
– আমি তো রাইতে থাকতে পারুম না। তাইলে খাওন দিবা না? না কী?
– লক্ষ্মী মাসি তো থাকবে।
– আরে থাকুক গিয়া। তারা পারে। আমি পারুম না। যারা আগে চইলা যাইব, তাগো খাওন দিবা না তাইলে?
– কীভাবে দেব? খাবারের আয়োজন তো ওই সময়েই।
– প্যাকেট নাই? প্যাকেটের ব্যবস্থা করতা?
– প্যাকেটের ব্যবস্থা করি নি।
– ক্যান্ করো নাই? হেইডা ভালো অইতো না?
– সমস্যা আছে। খাবার নিয়ে ঝামেলা হয়।
– লক্ষ্মীদির পোলাডারে বন্ধুরা খাওনের সময় ডাক দিয়া লইয়া গেল। আর ফিরল না। খাওনের কতা হুনলেই লক্ষ্মীদিও পোলাডার কতা মনে অয়। কষ্ট লাগে। তোমার মাসি তাইলে লক্ষ্মীদি। আমি বাসে উইঠা ভাবলাম মাইয়া ডা ক্যাডা? লক্ষ্মীঠাকুরের মতো লাগতাছিল। এই যে, আপনি কই নামবেন? কী? কালিরবাজার? এই চাচায় বোলে কালিরবাজার নামবে। তুমি কই নামবা? চাষাঢ়া?
ওই লোকটা আবার মহিলার দিকে তাকায়। মুখে মিটিমিটি হাসি, চোখে ভ্রূকুটি। বিড়বিড় করে বলে– বয়সে আমার ডবল। আর আমারে কয় চাচা? কচি খুকি!

বাসটা হঠাৎ ব্রেক কষল। চাষাঢ়া। হাতের ক্যালেন্ডারটা রাখতে ভুলে গেছি। তাড়াতাড়ি নামছিলাম। বলে উঠলেন–

– এই এই ক্যালেন্ডারটা রাইখা যাও। তুমারে দেবানি একটা। অনুষ্ঠানের দিন নিয়া আসবুনে। অহন নিও না। তোমার হাজব্যান্ডরে চিনাইও অনুষ্ঠানের দিন। আমারে চিনতে পারবানে তো? আমার নাম শেফালি। মনে রাইখো কিন্তু।

সন্ধে সাতটা। নারায়ণগঞ্জ ক্লাব কনভেনশন হল। মাইক্রোফোন হাতে অনুষ্ঠান ঘোষণা করছেন উপস্থাপক। এ সময় তিন-চারজন শ্রোতাসহ হলে প্রবেশ করেন শেফালি রানি। সামনেই পড়ে যাই আমি। উল্লাসে ডাক দেয়–

– এই, এই যে, চিনতে পারতাছো আমারে? শেফালি। আমার নাম শেফালি। মনে নাই, বাসে দেখা অইছিলো? তুমি আমারে কার্ড দিছিলা? এই যে কার্ড। কইছিলাম না তিন-চাইর জনরে নিয়া আসবুনে? হ্যাগো নিয়া আইছি। অনুষ্ঠান শুরু অইয়া গ্যাছে নাকি? অইযে ক্যাডা, মাইকে কতা কয়?

– আমার হাজব্যান্ড।

– ওমা এ দেহি মৌলভিসাব, চুল-দাড়ি-পায়জামা-পাঞ্জামি। ওই তুমার হাজব্যান্ড? ও বুঝছি ক্যান তুমি শাঁখা-সিঁদুর পরো না। মোসল্‌মান বিয়া করছো। নাকি আসলে তুমি নিজেই মোসল্‌মান?

উদ্বোধনী পর্ব শেষ। সবাই যে যার আসন গ্রহণ করেছেন। আমি ঘোষণা দিলাম– এবারের শিল্পী ওস্তাদ গুলরাজ খাঁ। রাগ ইমন। শিল্পী মঞ্চে আসন গ্রহণ করলেন। তবলা তানপুরা এস্রাজের সুর বাঁধলেন। মাইক ঠিক করলেন। টুংটাং করতে করতে কেটে গেল বেশ কিছুক্ষণ। এরপর দীর্ঘ আলাপ বিস্তার। তারপর খেয়াল। পাল্টা। পরে ছোট্ট করে বাংলা খেয়াল। লক্ষ করলাম মাঝে মাঝে দু'কানে আঙুল দিয়ে বসে আছে শেফালি রানি। চল্লিশ মিনিট গেয়ে থামলেন শিল্পী। আমি শেফালি রানির কাছে গেলাম কেমন লাগল জানতে। আমাকে দেখেই উত্তেজিত–

– এই হুনো, এই শিল্পী যে রাগারাগি করল তার নাম কী বললা? রাগ কী 'মন' না কী য্যান বললা?

– রাগ ইমন।

– ও আইচ্ছা। বোঝা গেছে শিল্পীর রাগ আছে। বাব্বা, কতক্ষণ রাগারাগি করল একলা একলা। আর ওইডা কী যন্ত্র লম্বা, নিচে পাতিলের মতো? কান্ডা ধরে কতক্ষণ যে মোচড়ামুচড়ি করল? আইচ্ছা, শুরুতে অতক্ষণ ঘ্যানঘ্যান করল ক্যান? অসহ্য। আমি কানে আঙুল দিয়া বইস্যা ছিলাম। কিচ্ছু বুঝলাম না। খালি বুঝলাম শ্যাষের কয়ডা কতা, বারবার কইছিল– রাধার কোমরে ঘা, রাধার কোমরে ঘা। শেষে কইল, রাধার কোমরে ঘাগরা। এইডা এট্টা গান অইলো? এক কতা বারবার কইতাছে তো কইতাছেই। রাধার কোমরে ঘা তো মলম দিলেই অইলো! সারা রাইত কি এইসবই হইবো নাকি? মাইনসে বকা লাগায় না তুমাগো? আমি বাপু বেশিক্ষণ এইসব হুনতে পারুম না। বসবার জইন্যে চেয়ার দ্যাও নাই ক্যান? পাৎলা এট্টা কাপুর দিছো। হ্যাতে কি কাল মানে? নিচেরথোন কাল ওঠে না? পাছায় ঠাণ্ডা লাগে। তুমাগো মাথায় যে কী আছে, ক্যাডা জানে? মাইর ধোইর না খাও। হ্যার পর কী অইবো?

– তবলার লহরা।

– ও আইচ্ছা। আবার হেই ঠুন্‌ঠান্‌। আগেরথোন ঠিক কইর‍্যা রাখবার পারে না? এ কী! এ কী শুরু করছে? তবলাগুলারে ফাটাইয়া ফ্যালবো নাকি? থামতে কও। ফাইট্যা যাইবো যে। এই লোকগুলা বোকার মতো বইস্যা বইস্যা এইসব কী দ্যাখতাছে ক্যাডা জানে? মাগো, পাগোলের কাণ্ড! খাওন দিবা কুন সময়?

– রাত দেড়টায়।

– অতক্ষণ থাকবার পারুম না। বুঝছি, এইডা তুমাগো চালাকি। খাবারের লোভ দেখাইয়া লোকজন ধইরা রাখো।

এরপর শুরু সেতার আর সরোদের যুগলবন্দী। ওস্তাদ বিল্লাল খাঁ এবং ওস্তাদ ভগত তিলওয়ালকার। সাথে তবলার সঙ্গত। ঝড়ের গতিতে চলল প্রায় পৌনে এক ঘণ্টা। সব মিলিয়ে অসাধারণ পরিবেশনা। দর্শক-শ্রোতা বিমোহিত। মুহুর্মুহু তুমুল করতালি। দীর্ঘক্ষণ বৃষ্টির মতো চলল। শেফালি রানির প্রতিক্রিয়া–

– হ্যারা কী বুইজ্জা তালি দেয়? কিছু বোঝে, না আন্দাজেই তালি দেয়? আমারতো কান ঝালাপালা। কানের ডাক্তার দেখাইতে অইবো। আগে জানলে আইতাম না এইসব ক্যাচাল হুনতে। তুমি আগে কও নাই ক্যান যে এইসব অইবো? তাইলে তো বাড়িতে বইস্যা নিরালায় গুমাইতাম।
– কার্ডে তো সব লেখাই ছিল? তাছাড়া বলেওছিলাম যে ক্ল্যাসিকাল মিউজিক।
– ধুর তুমার কার্ড। বুজছি নাকি? শাস্ত্রীয় সংগীত মানে যে এইসব তা ক্যাডায় জানত? আ আ আ আ করবে তা বুঝছিলাম। তা যে এত ক্যাডা জানত? তহোন কি আর বুঝতে পারছি এত রাগারাগি, এত দাপাদাপি?
– এগুলোই সংগীতের ভিত্তি। সব সংগীতেরই মূল বিষয়।
– রাখো তুমার মূল। খালি মূল নিয়াই থাকো তুমরা, কাণ্ডের আর দরকার নাই। তার চাইতে মমতাজরে আনতা, জমাইতে পারত। এতক্ষণ নাচানাচি শুরু অইয়া যাইত। দুই চাইরডা দাগি গান লাগাইত, শীতের মধ্যে শরিলডা গরম অইতো। এই নেও তুমার কার্ড। খাওনের কাম নাই। আমরা থাকবার পারুম না আর। চললাম।

যোগেশের মৃত্যু বিভ্রাট

নবমী পূজার দিন টেলিগ্রাম এল। যোগেশ মারা গেছে পঁচিশ দিন। যোগেশের মৃত্যু সংবাদ নিয়ে প্রথমে কিছুটা গোলযোগ এবং অতঃপর জলযোগ ঘটেছিল। বাজতে বাজতে হঠাৎ নবমী পূজার ঢাক গিয়েছিল থেমে। বিজয়ার বিসর্জনের অশ্রু তাই একদিন আগেই ঝরেছিল। আর সে অশ্রুপ্রপাতের কারণ একখানা টেলিগ্রাম। টেলিগ্রামখানা এসেছিল দুপুরের আগেই। জগদীশের নামে। যোগেশের মৃত্যুসংবাদ ছিল তাতে। জগদীশ যোগেশের একমাত্র ছেলে। আর যোগেশও জগদীশের একমাত্র বাবা। জগদীশ যোগেশকে বাবা বলে। আদর করে যোগেশও জগদীশকে বাবা বলে ডাকে। বহু আগেই, ছেলেবেলায়, তাই জগদীশ একদিন প্রশ্ন করেছিল যোগেশকে– বাবা, তুমিও আমারে বাবা কও, আমিও তোমারে বাবা কই; তয় আমরা কি দুই ভাই? শুনে জগদীশকে বেশ ধমকেছিল যোগেশ।
বেশ কয়েক বছর আগে একমাত্র স্ত্রী তারাময়ী এবং একমাত্র কন্যা জগন্ময়ীকে নিয়ে যোগেশ গেছে ভারতে। টেলিগ্রামখানা এসেছে সেখান থেকেই। যাহোক, টেলিগ্রামের কাগজটা হাতে পেয়ে জগদীশ পাঠকের অভাবে রেখে দিল বালিশের তক্তার উপর। বাড়িতে দুর্গা পূজা। নবমীর আনন্দ। বিকেলে বন্দোবস্ত খাবার দাবারের। তারই আয়োজন চলছে সারা বাড়িতে। এপাশে উনুন জ্বলছে ভাতের, তো ওপাশে জ্বলছে তরকারির। পুরুষেরা জ্বালানি দিচ্ছে সারিবদ্ধ ভাতের পাতিলে। তরকারি রান্না করছে মহিলারা। ঘামে জুবুজুবু। তরকারিতে হলুদ বা লবণ দেয়ার সময় খেজুর রসের মতো টপ্ করে ঘামও পড়ছে দু'এক ফোঁটা ঝরে। সেদিকে কারো খেয়াল নেই। সবাই ব্যস্তসমস্ত। নৌকার বৈঠা দিয়ে ঘুটোচ্ছে কচুর তরকারি। তুস্ দিচ্ছে ছিটিয়ে উনুনে। উড়ছে ধোঁয়া। ফুটছে ফ্যান। ফ্যানের গন্ধ, ঘামের গন্ধ, তরকারির গন্ধ, সবমিলিয়ে এক বিশ্রী ব্যাপার। ছেলেমেয়েরা খেলছে তেঁতুলবীজ। জামাই জনে খেলছে তাস। গমগম করছে লোক। দৌড়াদৌড়ি, হুড়াহুড়ি লেগেই আছে। অতিথিরা দু'একজন শুরু করেছে আসতে। 'দিদি ডাইলডা এট্টু দেইখ্যো' বলে ঘাম মুছতে মুছতে চলে গেল ভাগ্যধরী।
ভাগ্যধরী জগদীশের একমাত্র বউ। তার আবার বিড়ির নেশা। ঘরে গিয়ে তামাক পাতা বের করে খুঁজে পেতে বের করল এক টুক্‌রো কাগজ। ছিল বালিশের তক্তার উপর। তামাকপাতা কাগজটায় পেঁচিয়ে, ঘরের কোণে বসে খড়ি ধরানো আগুনে বিড়িটা জ্বালল। দু'একটা সুখটান দিতে না দিতেই ঘরে ঢোকে জগদীশ। বালিশের তক্তার উপর কী একটা খুঁজতে থাকে। বাড়িতে শিক্ষিত লোক এসেছে দু'একজন। তাদের দিয়ে পড়াতে হবে টেলিগ্রামখানা। জগদীশ জানত, বউয়ের বিড়ির নেশা। তাই শরম না পেয়ে বউ বলল– কী খুঁজতাছ? খুঁজতে খুঁজতে জগদীশ বলল– এট্টা কাগজ এইহানে রাখছিলাম, গেল কোথায়? বউ বলল– আমি তো একখান কাগজ নিয়া বিড়ি বানাইছি, দ্যাহো তো এইহানা নাকি? জগদীশ দেখল সর্বনাশ হয়ে গেছে। সেই টেলিগ্রাম দিয়ে বউ বিড়ি বানিয়েছে। তাই তাড়াতাড়ি বলে উঠল – হরছোস্ কী, হরছোস্ কী? শিগগির নিবা, ওডা টেলিগ্রাম। বউ বিড়ি নিভালে দেখা গেল, নিচের কিছুটা লেখা অংশও পুড়ে গেছে।
যাহোক, সেই আধপোড়া টেলিগ্রামখানা নিয়ে হাজির হলো জগদীশ। উঠোনে। যেখানে কথাবার্তা বলছিল দু'একজন শিক্ষিত লোক। সবাই ঝুঁকে পড়ল কাগজখানার দিকে। তাতে লেখা ছিল Father Expired, নিচে Jag … তারপর পোড়া কাগজের প্রান্ত। পাঠকগণ পড়তে পারলেন ঠিকই, তবে অর্থ বুঝতে একটু গোলমাল করে ফেললেন। তারা ওষুধের বোতলের গায়ে সাঁটা লেবেলে Expire শব্দটা লেখা দেখেছেন। তার পাশে দেখেছেন তারিখ লেখা। ইংরেজিতে। তারা তার অর্থ জানতেন, ওই তারিখে ওই ঔষধের মেয়াদ শেষ। এরপর ব্যবহারযোগ্য নয়। এখানেও তার ব্যতিক্রম কিছু ভাবতে পারলেন না। বললেন, এ লেখার অর্থ দাঁড়ায়, পিতার মেয়াদ শেষ। অর্থাৎ, অব্যবহারযোগ্য। কিন্তু নিচে লেখা Jag। তাহলে ধরে নিতে হবে জগের পিতা অকেজো। মানেটা বড় গোলমেলে। তুমি বরং ইংরেজির মাস্টারকে দেখাও। ইংরেজির মাস্টার এসে পৌঁছয় নি তখনও। তাই এ লেখা নিয়ে জল্পনার হলো না শেষ। কেউ বলছে, আইজ ফাস্ট এপ্রিল নাকি? দ্যাহো ক্যাডা ঠগ্ দেছে? কেউ বলছে, ওডা এমন কিছু না; স্রেফ এ্যাট্টা ধাপ্পাবাজি। টেলিগ্রাম আইস্‌তে তার লাগে।

ততক্ষণে পৌঁছে গেলেন ইংরেজির শিক্ষক। টেলিগ্রামটা এগিয়ে দিয়ে জগদীশ বলে–
– স্যার, এইড্যা এট্টু পড়েন দিহি, কী ল্যাখছে?
শিক্ষক পড়ে যা বললেন, তা এরকম– তোমার বাবা কি অসুস্থ ছিলেন?
জগদীশ– স্যার, ম্যালাদিন কোনো খবর-টবর জানি না।
শিক্ষক– তিনি মারা গেছেন আজ পঁচিশ দিন।
জগদীশের মাথায় যেন বাজ পড়ল।
বলল– স্যার, সত্যি কইছেন?
শিক্ষক– হ্যাঁ, তাই তো লেখা টেলিগ্রামে।
হাঁউমাউ করে কেঁদে উঠল জগদীশ। মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়ল মাটিতে। ছুটে এল লোকজন। কথাটা ছড়িয়ে পড়ল ক্রমশঃ। কান্নাকাটির রোল পড়ে গেল। নাকের জল আর চোখের জলের ফসফসানি শব্দ। যারা রান্না করছিল তারাও ছুটে এল। হাঁড়ির জল শুকিয়ে ভাত লাগল পোড়া। ডাল গেল শুকিয়ে। কে করে খেয়াল? বাড়িতে শোকের ছায়া। দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে এক বুড়ি বলল– কী য্যানো ল্যাহা আইস্‌ছে, তাইতে গুস্টিহুদ্দা কানতাছে। এ্যাট্টা কাগজের কী তেজ?
পেটুক শ্রেণির দু'একজন বলল–
– টেলিগ্রাম আসার আর দিন পাইল না? আইজ খাওয়া-লওয়ার দিন, দিনডাই মাডি অইয়া গ্যালো।
যাহোক, অপরিতৃপ্তির সাথে শেষ হলো নবমীর ভোজ। বাচ্চা পোলাপানদের মনে মনে যোগেশের উপর রাগই হলো। তাদের পুরো ফুর্তিটুকুই মাটি হয়ে গেল। হাতের কাছে পেলে, তারা যেন যোগেশকে ল্যাংটা করে ছাড়ে। খাওয়া দাওয়া শেষ হলেও হ্যাজাক নিভল না। যোগেশের মৃত্যুর পঁচিশ দিন পর জগদীশের তথা সমাজের কী কর্তব্য, তা নিয়ে মাথা মাথা সমাজপতিরা বসলেন। পান-তামাক শেষ হতে থাকল। রাত্রি গড়াতে গড়াতে শেষে ভোর হলো। বুড়োদের জোনাকির মতো পিটপিটে চোখ ধীরে ধীরে মিইয়ে এল। শেষে পুঁথি পুস্তক বন্ধ রেখে ব্রাহ্মণ বললেন– এ মৃত্যুর কোন ভালো বিহিত পাইলাম না। শেষ পর্যন্ত সমাজপতিরা সিদ্ধান্ত দিলেন যে, ধরা যাক আজই মারা গেছে যোগেশ। কারণ, আজই এখানে পৌঁছেছে খবর। আজ থেকে গুরুদশা পালন করবে জগদীশ। ত্রয়োদশ দিনে হবে শ্রাদ্ধ। তবে দশম দিনে দশপিণ্ড দান শেষে মস্তক-মুণ্ডন করে জগদীশ মন্ত্রপূত হবে।
পরদিন সকালে গলায় ধড়া পরানো হলো জগদীশকে। হাতে দেয়া হলো কুশাসন। নাকি কু-শাসন? পরনে পাঁচকাঠি মার্কিন থান কাপড়। রুক্ষ চুল, অশ্রু ঝরা দু'টি চোখ। ফোলা। এক কিশোরীর চোখে বর্তমান জগদীশ এক আজব জীব। সে জগদীশকে দেখে খিল খিল করে হেসে দিল। এর আগে তার চোখে এমন জিনিস পড়ে নি। সে লুকিয়ে লুকিয়ে দেখে, আর খিলখিলিয়ে হাসে। কিশোরী, সম্পর্কে জগদীশের ভাস্তি। কিশোরী সঙ্ দেখেছে। তাই ভাবছে, পূজা মন্দিরে কাকু সঙ্ দেবে। জগদীশের ছেলে জগমোহনের বয়স পাঁচ/ছয় বছর। তার কিন্তু ব্যাপারটা বেশ ভালো লাগছে। তার বাবা বর্তমানে এক আজগুবি জিনিস হয়েছে। তারও ওই সাজে সাজতে ইচ্ছে করল। তার মাকে, বাবাকে উত্তপ্ত করে তুলল কথাটা বলে বলে। জগদীশ বুঝাচ্ছে, বাপ-মা না মরলে এগুলা কেউ পরে না বাবা। এ্যাহোন থাউক। আমি মরলে তারপর তুই গলায় ধড়া পরিস। ছেলে বলে, তয় তুমি মর। আমি গলায় ধড়া পরব। যখন কোন কথায় ছেলের কান্নাকাটি থামে না, তখন তার গলায় ধড়া দেয়া হলো পরিয়ে। ছেলে মহাখুশি। লাফাতে লাফাতে চলে গেল রাস্তায়। মরা মরা খেলা। সবাইকে বলছে, তার বাবা মারা গেছে; এই জন্যে সে গলায় ধড়া পরেছে। তার খুব মজা লাগছে।

যোগেশের মৃত্যুর খবর পেয়ে ছুটে আসছে জগদীশের শাশুড়ি। পথে জগদীশের ছেলেকে দেখে গলায় ধড়া বাঁধা। তাহলে কি তিনি খবরটা ভুল শুনেছেন? বেয়াই মরে নি? মরেছে জামাই? মানে, মেয়ে বিধবা হয়েছে? আর চিন্তা করতে পারলেন না। হঠাৎ হাঁউমাঁউ করে কেঁদে দিলেন বুড়ি। জড়িয়ে ধরলেন জগদীশের ছেলেকে। সে কি কান্না! মনে হয় তার নিজের স্বামী গেছে মারা। সে কান্না দেখে জগদীশের ছেলেও কান্না শুরু করে দিল। বাচ্চাটা কোলে নিয়ে বুড়ি, ছুটল বাড়ির দিকে। বুড়ি কাঁদে আর বলে– এ কী অইলোরে, হায় বিধি! দ্বিতীয় আর কোন কথা এ মুহূর্তে শাশুড়ির মনে এসছিল না। তাই গ্রামোফোনের দাগকাটা রেকর্ডের মতো

ঘুরে ঘুরে একই কথা বাজতে লাগল বার বার– এ কী অইলোরে, হায় বিধি! বাড়ির লোকেরা ভাবল– যোগেশের মৃত্যু সংবাদ শুনে বুঝি বুড়ি এত উতলা। হাজার হোক বেয়াই তো! আর তা ছাড়া যোগেশ এদেশে থাকতে বুড়ি সম্বন্ধে দু'পাঁচ কথা উঠেছিল। সেটা কি মিথ্যে?
বুড়ি কান্নার মাত্রাটা আর একটু চড়িয়ে শোকের তীব্রতা প্রকাশ করল। গলায় সাইরেন বাজিয়ে শোকের সমূহ ভয়াবহতা ঘোষণা করতে করতে ঘরে ঢুকে ভূত দেখল। দেখল জামাই ভূত হয়ে বসে আছে। চম্‌কে উঠল। কণ্ঠের ফ্রিকোয়েন্সি দিল বাড়িয়ে। ভূত জামাই দেখে মানুষ শাশুড়ি গলার সর্বোচ্চ স্কেলে চিৎকার করে উঠল। ভূত! ভূত!! বলে দৌড়ে বেরুল ঘর থেকে। নিজের কাপড় পায়ে জড়িয়ে পড়ে গেল অজ্ঞান হয়ে উঠোনে। চিৎকার শুনেই বাইরে বেরিয়ে এসেছে জগদীশ। বুড়ি হলেও এমন অশোভন অবস্থায় শাশুড়ির দিকে তাকাতে লজ্জা হচ্ছিল তার। সে দেখল আংশিক মা কালী হয়ে পড়ে আছেন শাশুড়ি। দাঁতে কপাটি। লোকজন জড়ো হয়ে গেল। তেল, জল, ঝাড়ফুঁক ইত্যাদি ইত্যাদি . . . । সে এক কাণ্ড বটে।
দিন যায়। বাড়ির চেহারা পরিবর্তন হয়। পুজো বাড়ি ক্রমশঃ রূপান্তরিত হলো শ্রাদ্ধ বাড়িতে। বড় বড় গাছ কেটে জ্বালানি কাঠ করা হয়েছে। সারি সারি রাখা হয়েছে সাজিয়ে। তাতে গোবর ছটা। জগদীশের ছেলে জিজ্ঞাস করছিল– চলায় গোবর দেয় ক্যান, বাবা? জগদীশ বলেছিল– গোবর দিলে কাষ্ঠ শুকায় ভালো; আর গোবর যে পবিত্র জিনিস। জগদীশের ছেলে ভাবে– গরুর পায়খানাই এত পবিত্র; তাহলে মানুষের পায়খানা তো আরও পবিত্র। সে নিজে পায়খানা করে কয়েকটা কাষ্ঠে মাখিয়ে দিল কিছুটা।
কয়েকদিন বাদে ইংরেজি শিক্ষক মন্ময়বাবুর সাঁই করে একটা চিন্তা খেলে গেল মাথায়। সেট হলো– টেলিগ্রামের অর্থ তো বলে দিলেন পরিষ্কারই। কিন্তু, নিচে যে Jag লেখা, তার অর্থ কী? হিসেব মেলাতে পারলেন না তিনি। জামাটা গায়ে ঢুকিয়ে চলে গেলেন জগদীশের বাড়ি। টেলিগ্রামটা চাইলেন। পেলেন। আবার পড়লেন। Jag এর কোন মানে পেলেন না। হঠাৎ মাথায় একটা বুদ্ধি খেলে গেল। এর পরের অংশ পোড়া। এমনও তো হতে পারে যে, পোড়া অংশে আরও কিছু লেখা ছিল। থাকতে পারে কারো নাম। জগন্ময়, জগদীশ্বর, জগবন্ধু কিংবা জগৎচাঁদ! কত কিছু! আর নিচে নাম থাকা মানে লেখকের নাম। তাহলে তো Father Expired বলতে লেখকের পিতাই বুঝায়। জগদীশের পিতা হয় কী করে? My Father বা Your Father তো লেখা নেই? জগদীশকে জিজ্ঞেস করলেন মন্ময়বাবু–
– সেখানে জগন্ময় বা জগৎচাঁদ কিংবা জগবন্ধু অথবা ঐ জগ দিয়ে আর কারও নামে কেউ আছে কিনা?
জগদীশ বলল– আছে, আমার বুইন জগন্ময়ী আছে; জ্যাঠাতো ভাই আছে জগবন্ধু। ক্যান কী অইছে?
মন্ময়বাবু বিভ্রান্তিতে পড়লেন। প্রশ্ন করলেন–
– আচ্ছা, তোমার জ্যাঠা কি জীবিত?
জগদীশ বলল– জীবিত।
– তোমার জ্যাঠা আর বাবার মধ্যে বয়স কার বেশি?
প্রশ্নটা করেই চম্‌কে উঠলেন মন্ময়বাবু । প্রশ্নটা ঠিক হলো না। শুধরে বললেন– কে বেশি বুড়া? তাও মন পুত হলো না। আবার বললেন– কে বেশি রোগা বা কার বেশি মরার সম্ভাবনা?
জগদীশ বলল– তা ক্যামনে কব? তয় জ্যাঠার চাইতে বাবার বয়সতো ম্যালা কম।
মন্ময়বাবু বললেন– হুঁ, তাহলে তোমার জ্যাঠাও মরতে পারে।
বিকেলে আবার লোকজন জড়ো হলো। ঝানু ঝানু রুই কাৎলা থ' মেরে গেছে। যেন নিরাক-পড়া বিকেলে ঝিম্‌ মেরে গেছে ধানক্ষেতে। তল পাচ্ছে না। কোন কিনার পাচ্ছে না। মন্ময়বাবুর কথায় যৌক্তিকতা আছে। কে একজন বলে উঠল– ভোগেশ বড় অইলে কী অবে, যোগেশই বেশি বুড়া; দ্যাহো না, মাথাডা একদম তালের আডির মতো সাদা। একজন বলল– ছোডকালেই হ্যার চুল পাকছে; বুড়ার জন্যে না। ছোডকালে ঘি খাইয়া হাত মাথায় মুছছিল, হেই জইন্যে তার মাতার চুল পাইক্যা গ্যাছে।
টেলিগ্রাম পাঠিয়েছে জগন্ময়ী, নয়ত জগবন্ধু। জগন্ময়ী পাঠালে মারা গেছে যোগেশ। আর জগবন্ধু পাঠালে মারা গেছে ভোগেশ। কে মারা গেছে, ঠিকভাবে না জেনে জগদীশের গলায় গুরুদশার মালা পরানো ঠিক হয় নি। এখন ওটাকে কেউ ধড়া বলে না। কারণ, যোগেশ যে সত্যি মারা গেছে, তার পাকা কোন প্রমাণ হাতে নেই। তাই সর্বসম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হলো, গলার ওটাকে ধড়া বলা যাবে না। মালা বলতে হবে এবং মালা

খুলে থান ছেড়ে আবার লুঙ্গি পরতে হবে। কুশাসনের দরকার নেই। জগদীশ হাঁ করে তাকিয়ে সব শুনল। এ সব সে কিছুই বুঝল না। ভালোও লাগল না। তার বাপ তাহলে মরে নি? এ কয়দিনে কেমন একটু শোক শোক ভাব আসছিল, তা উড়ে গেল। এ যেন মদের মতো। খাও তো নেশা হবে। একটু পরে নেশা কর্পুরের মতো উড়ে যাবে। কর্পুরের বোতল শুধু খোলা কিংবা বন্ধ, সেটাই ব্যাপার। জগদীশের মনের বোতলের ঢাকনা খোলা। তাই উড়ে গেছে শোক। এখন যেন কেমন না শোক, না সুখ ভাব। কুলেখাড়ার পাচনের মতো বিস্বাদ গুরুদশা।

জগদীশ এখন মাছ খায়, মাংস খায়। স্ত্রীর কাছে শোয়। কিন্তু মন কেমন খুঁত খুঁত করে। হলো কী ব্যাপারটা? বাবা মরল না? শোক শোক ভাবটাই কেটে গেল। মরলে ক্ষতি ছিল কী? বাঁচার আর সময় পেল না বুড়াটা? পুরা শোকটাই মাটি। দিন দুই বাদে স্বপ্ন দেখে জগদীশ, চিতায় দাঁড়িয়ে বাবা বলছে, 'তুই আবার মাছ-মাংস খাওয়া শুরু করলি? আমি কি বাইচ্যা আছি? আমার আত্মা সুখ পাবে না। তুই গুরুদশা পালন কর'। ভয়ে জগদীশের ঘাম ছুটে গেছে। বাবা তো তার সত্যিই মারা গেছে? পরদিন আবার সমাজপতিদের ডাক পড়ে। ডেকে সব বলে। সমাজপতিরা ভীষণ চিন্তিত। তারা ভাবে, না মরলে তো না-ই মরল। কিন্তু মরলে কী হবে? মরার পরও যদি সৎকাজ না হয়, তাহলে তো যোগেশের আত্মা উদ্ধার পাবে না। ভূত হবে। বরং সৎকাজ করাই ভালো। তাই আবার জগদীশের গলায় ধড়া উঠল, মার্কিন থান পরানো হলো। জগদীশ আবার ভাবতে লাগল, তার বাবা সত্যি মারা গেছে। আবার শোক শোক ভাব লাগছে। কিন্তু এ শোকটা যেন কেমন! এ শোক নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করতে পারে নি। এ শোক একশো পার্সেন্ট খাঁটি মনে হয় না। ভেজাল আছে। না শোক না সুখ মার্কা একটা অনুভূতি।

কিন্তু, সমস্যা দাঁড়াল আরেকটা। জগদীশের ধড়া একবার খুলে আবার বাঁধা হলো। কিন্তু, জগদীশের ছেলের গলার ধড়া খোলা গেল না। তার এই মরা মরা খেলাটা বেশ মজার লাগছিল। তার দেখাদেখি আরও অনেক ছেলে জুটে গেল, তারা খালি গায়ে গামছা পরে, হাতে কাশের গুচ্ছ নিয়ে, গলায় ধড়া বেঁধে, ধেই ধেই করে লাফিয়ে বেড়াতে লাগল রাস্তা দিয়ে। কিশোরীরাও বাদ পড়ে নি সে খেলা থেকে। তাদের এ মরা মরা খেলাটা জমছিল বেশ। হঠাৎ করে তাদের আত্মীয়রা তাদের দেখে কেঁদে ফেলে। তাতে বাচ্চাদের আরও মজা লাগে। পথেঘাটে এখন যখন তখন কান্নার রোল শোনা যায়। সারা গ্রামে কান্না কান্না একটা কায়দা চলছে। গ্রামটাই যেন কান্নার হাট। তারা কী একটা খেলাই না পেয়েছে? বেশ মজার।

শ্রাদ্ধের প্রস্তুতি চলছে। আর যোগেশের মৃত্যু নিয়ে যে বিভ্রাটের সৃষ্টি হয়েছে, তা থেকে পরিত্রাণ পাবার জন্য আবার টেলিগ্রাম করা হলো। তাতে লেখা হলো Whose Father Expired, Reply Soon। প্রথম টেলিগ্রামটা এল পঁচিশ দিন পর। এ টেলিগ্রাম গিয়ে আবার ফেরত আসতে কম করে হলেও পঁচিশ আর পঁচিশ পঞ্চাশ দিন সময় লাগবে। ততদিনে যোগেশের শ্রাদ্ধ বাসি হয়ে যাবে। যোগেশ প্রেতাত্মা হয়ে যাবে। তাই ঠিক হলো, ওই ত্রয়োদশ দিনেই শ্রাদ্ধ করা হবে। শ্রাদ্ধেরই যোগাড় চলছে এখন।

শ্রাদ্ধের আগের রাত। পরামর্শের ডাক। সভা বসেছে। এসছেন নিমন্ত্রিতরা। উপস্থিত সমাজপতিরা। সভা চলছে। সভাসদদের জন্য রান্না চলছে। সভা শেষে খাবে। কয়েকশো লোকের নিমন্ত্রণ আগামীদিন। কীভাবে তাদের খাবার পরিবেশন করা হবে, কোথায় কাদের বসানো হবে, কে কী পরিবেশন করবে ইত্যাদি ইত্যাদি নিয়ে চলছে আলাপ আলোচনা। ভাগ্যধরীর ছিল ডায়াবেটিস্। তরকারি রান্নার ফাঁকে মাঝে মাঝেই যেতে হচ্ছে হিসি দিতে। প্রস্রাবখানাটা বাড়িতে ওঠার পথের ধারে যে শশার মাচান, তারই পাশে। হিসি দিচ্ছে ভাগ্যধরী। অকস্মাৎ চমকে ওঠে। হিসির হয় গতিরোধ। সামনে দেখে একমাথা সাদাচুলো যোগেশ। শ্বশুর যে ভূত হয়েছে, বাকি থাকে না বুঝতে। ইরে বাবা, ভূত! বলে প্রচণ্ড চিৎকারে জ্ঞান হারায় ভাগ্যধরী।

বহুদিন পর দেশে ফিরছে যোগেশ। লঞ্চঘাটে যখন নামে, রাত তখন অনেক। বাড়ি ফেরার পথে রাস্তায় দেখা হয় ভবানীর সাথে। ভবানী পাশের গ্রামেরই এক দোকানদার। সাহসী। দোকান করে প্রায়ই বেশ রাতে বাড়ি ফেরে। সেও প্রথম ভড়কে গিয়েছিল যোগেশকে দেখে। চমকে উঠেছিল। ভয়ও পেয়েছিল একটু। হাসি হাসি ভাব করে বলেছিল– তা ভায়া, তোমার তো কাইল শ্রাদ্ধ; আইজ এহানে আইলা ক্যামোন কইর‌্যা? অবাক হয়ে গেছিল যোগেশ। ভবানীর কাছে ঘটনাটা শুনে বিস্মিত হয়ে গেল। বুঝতে বাকি থাকে না, কোনো গোলযোগ

হয়েছে। কথা বলতে বলতে ভবানী হঠাৎ জমির মধ্য দিয়ে কোনাকুনি দৌড় লাগাল। যোগেশ বুঝতে পারে যে ভবানী তাকে দেখে ভয় পেয়েছে। দ্রুত পা চালায় বাড়ির দিকে।
কাছে আসতে দেখল ভবানী মিথ্যে বলে নি। বাড়ি যেন আলোকোজ্জ্বল রঙ্গমঞ্চ। যাত্রা আরম্ভ হবে। এক্ষুণি। শ্রেষ্ঠাংশে যোগেশ। অপ্রাকৃত যোগেশ। কনসার্ট বাজবে। সে প্রবেশ করবে মঞ্চে। কী হবে? হাততালি, না ভূতের নাচন? এ মুহূর্তে ভাবুক হয়ে পড়ে যোগেশ। ভাবতে ভাবতে পথ দিয়ে উঠতে শুরু করে বাড়িতে। আর এ সময় ঘটে কাণ্ডটা। শশার মাচানের পাশে যোগেশের পুত্রবধূ ভাগ্যধরী গিয়ে বসেছিল ইয়ে করতে। হঠাৎ তার চোখ যায় পথের দিকে। দেখে, মৃত যোগেশ শশার মাচানের পাশ দিয়ে বাড়িতে উঠছে। ভাগ্যধরীর চিৎকার শুনে ভড়কে যায় যোগেশ। বুঝতে পারে, গোলযোগ হয়ে গেছে। বেটি ভয় পেয়েছে। তাকে ভূত ঠাওরেছে। চিৎকার শুনে ছুটে আসছে লোকজন। ভেবে পেল না যোগেশ এ মুহূর্তে ঠিক কী করা উচিত তার। তাই দ্রুত ঢুকে পড়ল শশার মাচানের তলে। লোকজন এল ছুটে। দেখল, চিৎপটাং দিয়ে প্রস্রাবের মধ্যে বে-আব্রু পড়ে আছে ভাগ্যধরী। গোঁঙাচ্ছে। দাঁতে কপাটি। অকুস্থান থেকে একদল কর্মী তাকে উদ্ধার করে ধন্য হলো। শুশ্রূষা চলল। মাঝে মাঝেই 'ইরে' বলে গগনবিদারী একটা চিৎকার দিয়ে উঠছে ভাগ্যধরী।
লোকেদের ধারণা, কিছু একটা দেখে ভয় পেয়ে থাকবে ভাগ্যধরী। তাই তারা টর্চের আলো জ্বেলে এদিক সেদিক একটু দেখল। হঠাৎ শশার মাচানের নিচে দৃষ্টি পড়ায় চম্‌কে উঠল সবাই। দেখল, কে যেন মাথা গুঁজে বসে। তারাও প্রথমে ভূত ভেবেছিল। পরে ভাবল, শশাচোরও হতে পারে। তাই তারা ধমকে উঠল–
– এই, ক্যাডা ওজায়গা? বের হ'। শালার শশাচোর? দাঁড়া, দ্যাখাইতেছি মজা।
লোকটা বের হলো না।
আবার ধমক– ক্যাডা তুই?
যোগেশ বলে ওঠে– আমি যোগেশ।
চম্‌কে ওঠে সবাই। ভয় পেয়ে যায়। ভাবে, সত্যি ভূত হলো না কি যোগেশ? আবার ভাবে, শশাচোর ধরা পড়ার ভয়ে যোগেশের ভয় দেখিয়ে পালিয়ে যাবার ফন্দিও করতে পারে।
তাই তারা বলে– মিথ্যা কথা রাখ। যোগেশ তো মারা গেছে?
যোগেশ বলে– আমি তো মরি নাই, দ্যাখছ না?
লোকজন বলে– তার প্রমাণ কী? আমরা সরকারি কাগজে ছাপানো টেলিগ্রাম পাইছি, তুমি মরছ। সরকারি কাগজের চাইতে তোমার কতার দাম বেশি?
যোগেশ বলে– আমি মরি নাই, এই দ্যাহো।
এই বলে মাথা উঁচু করে পিট্‌ পিট্‌ করে তাকায়। লোকজন অসম্ভব সাহসী ছিল। তারা দেখে, সত্যিই তো যোগেশ। আবার ভাবে, ভূতও হতে পারে। বিচিত্র কী? কেউ ভাবল গুরুদশা পালনে জগদীশের অনিয়মের কারণেই যোগেশ ভূত হয়ে গেছে। তাদের সাহস চরমে পৌঁছল। যার হাতে টর্চলাইট ছিল, সে চম্পট দিতেই সবাই হুড়মুড় করে দিল দৌড়। কেত্তন যা লাগল। এ যেন ভূতের শ্রাদ্ধ বাড়ি। যে যেদিক পারে, প্রাণভয়ে ছোটে।
বাড়িতে হুলস্থূল পড়ে গেল। ভূত! ভূত!! শশাতলা ভূত! যোগেশ ভূত হয়েছে।

শ্রীশ্রী দুর্গাদাস পণ্ডিতের দেহত্যাগ

চশমার পুরু লেন্সের ভিতর দিয়ে চোখ বড় বড় করে আমার দিকে তাকিয়ে তিনি বললেন–

– বলতো ছোক্‌রা, আমার নাম দুর্গাদাসবাবু হলো কেন?

কমলা রঙ বিকেল। চা-মিষ্টির দোকান। বিকেলের রোদ এসে পড়ছিল রসগোল্লার গামলায়। তার থেকে ছিটকে আসা রোদ নাচছিল দুর্গাদাসবাবুর মুখে। চোখে। তাকে তখন ভূতের মতো লাগছিল। মাথার চুল তালের আঁটির মতো সাদা হলেও ভ্রূ তার কুচকুচে কালো। পাতলা। তা হোক। সমস্যা অন্য জায়গায়। সেগুলো বেশ বড় বড় এবং পুরু লেন্সের ভিতর দিয়ে শুয়োরের লোমের মতো দেখাচ্ছিল। চোখ দু'টো গোল গোল। বড়। যেন মস্ত কালো দু'টো পান্তুয়া। মুখের চামড়া হাতির পাছার মতো কোঁচকানো। কান দু'টো রাম করতাল। তার উপর ইয়া বড় বড় লোম। গোঁফজোড়া মনে হয় দু'দিক থেকে দু'টো কাঠবিড়ালি এসে ঢুকে পড়েছে নাকের মধ্যে। লেজ দু'টো পড়ে আছে বাইরে। নাক বলতে শুধু একটা গর্ত। উপরের অংশ উধাও। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় জার্মান বোমার আঘাতে নাকি উড়ে গেছে। নাক উঁচু মানুষ তার পছন্দ নয়। তার কথা হলো– নাকের উঁচু অংশের কী দরকার? শ্বাস-প্রশ্বাস ঠিকমতো নিতে পারলেইতো হলো? এ নিয়ে এত ভাবনা কীসের? উপরের এবং নিচের পাটির সামনের চারটি করে দাঁত নেই। মহাত্মা গান্ধী নাকি ঘুসি মেরে উড়িয়ে দিয়েছেন। জিভটা তার ওই ফাঁকে এসে লেগে থাকে। মনে হয় জলের মধ্যে কচুরির ফাঁকে নাপিত মাছ থ' মেরে দাঁড়িয়ে রয়েছে। আমার গায়ে কাঁটা দিচ্ছিল। আবার ধমক দিয়ে বললেন–

– কীরে, পারলি না বলতে, আমার নাম দুর্গাচরণবাবু কেন?

আমি তখন ক্লাস এইটে। গোবেচারা। অবশ্য ধর্ম পড়ি। তাই বললাম–

– আজ্ঞে, চরণ মানে পা। তাই দুর্গাচরণ মানে দুর্গার পা। আর আপনি ভদ্রলোক বলেই বাবু।

– কী বললি, বেয়াদ্দপ।

ধমকে উঠলেন তিনি।

– আমি দুর্গার পা? মানে মেয়েলোকের ঠ্যাং? জানোয়ার কোথাকার! অবশ্য শেষেরটা ঠিক বলেছিস। বাবু শব্দের ব্যাখ্যাটা। কিন্তু বিকৃত করে বললি কেন? বলবি দুর্গাদাস কেন হলো?

– আপনি তো দুর্গাচরণই বললেন।

– চোপ, মুখে মুখে তর্ক? নেতাজি সুভাষ বোস পর্যন্ত আমার মুখের উপর কথা বলত না। দাঁতের ফারাক্কা দিয়ে বাতাস বেরিয়ে গেছে বলে তুই দাসকে চরণ শুনবি? বেআক্কল যেন কোথাকার! বল, দুর্গাদাস কেন হলো?

ভয়ে ভয়ে বললাম– দুর্গাদাস মানে দুর্গার দাস, মানে দুর্গার সেবক।

চটে গেলেন তিনি– কেন, কেন, আমি কেন দাস হতে যাব? আমাকে চিনিস? সবার দাস আমি, থুক্কু, আমি সবার দাস, ধ্যাৎ, কথাটাও ঠিকমতো হচ্ছে না কাজের সময়, কথাটা বড় গোলমেলে তো– যাকে বলে সবার আমি দাস। না। এবারেও হলো না। কথাটা হবে– সবাই আমার দাস। এবারে হয়েছে। বড় ফুটকলাই মার্ক কথা– দাঁত ভাঙে।

রাগে গরগর করতে করতে বললেন দুর্গাদাসবাবু–
– জানিস, এই যে বীরেনের দোকান, যে দোকানে তোরা বসে আছিস, এই দোকান থেকে প্রতিদিন সকালে যদি আমার বাড়িতে এক কাপ করে গরম চা লঞ্চে পাঠিয়ে না দিত, তাহলে ওর দোকানটাই উঠিয়ে দিতাম এতদিনে।
সকালের লঞ্চটা দক্ষিণ দিক থেকে এসে বাজার হয়ে চলে যায় উত্তরদিকে। কিন্তু দুর্গাদাসবাবুর লজিং বাড়ি বাজারের আধামাইল দক্ষিণে। লঞ্চটা দুর্গদাসবাবুর ঘাট হয়ে ফেরে বিকেলে। অতএব চা পাঠানোর বিষয়টা অবান্তর এবং রীতিমতো অবিশ্বাস্য। বহু সাহসে ভর করে বললাম–
– সকালেতো লঞ্চ বাজারে আসে আপনার বাড়ির কাছ দিয়েই? তাহলে চা পাঠায় কী করে?
থতমত খেয়ে বললেন– এ্যা, তাই তো?
আমি বললাম– বরং সন্ধ্যার লঞ্চে পাঠাতে পারে। ফেরার পথে।
হেসে দিয়ে– হ্যাঁ হ্যাঁ, তুই ঠিক বলেছিস। সন্ধ্যার লঞ্চে পাঠায়। বয়েস হয়েছে তো, ভুল মেরে বসে থাকি। একশো আটানব্বই। আর দুই হলে ডবল সেঞ্চুরি।
অমনি হঠাৎ ফোঁস করে উঠলেন–
– এই, সন্ধ্যা আর সকালে তফাৎটা কী রে? দু'টো সময়ই একটু অন্ধকার অন্ধকার ভাব। ও তো পৃথিবীরই ছায়া। এ বিশ্বে সকাল-সন্ধ্যা বলে কিছু আছে নাকি রে অকালকুষ্মাণ্ড? সূর্য দেখে তোরা হিসেব করিস কেন, বলতো? সময় অখণ্ড। অখণ্ডমণ্ডলকারণ। সময় কি মেয়েলোকের চুলের ফিতা, যে ইচ্ছে করলেই কাঁচি দিয়ে কেটে ফেলবি– ক্যাচ? যত্তোসব মূর্খের দল! সূর্য কী, জানিস? সূর্য? সূর্য হলো আকাশের টিপ্। মায়ের কপালের সিঁদুরের ফোঁটা। আকাশ হলো মা। কত কোটি কোটি গ্রহ-নক্ষত্র তার কোলে শুয়ে আছে, জানিস? আকাশ তো আর জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি গ্রহণ করে নাই? ধ্যুৎ, কাদের শেখাচ্ছি এসব? এসব হচ্ছে দার্শনিক তত্ত্ব। তোরা বুঝবি না। ফিলছবি। ফিলছবি বুঝিস? ফিলছবি মানে অনুভবে দেখা ছবি। ফিল মানে অনুভব করা।
আমরা সবাই হাঁ করে গিলছিলাম কথাগুলো। এর মধ্যে কেষ্টা প্রশ্ন করল–
– দুর্গাদাদা, ওই ট্রেন ডাকাতির ঘটনাটা আর একটু বলেন না?
ফোকলা দাঁতে একগাল হেসে আবার শুরু করলেন–
– ও, ওইটা? শোন্ তাহলে, বলছি। ছেলেবেলা থেকেই আমি দুরন্ত। ছুটন্ত ঘোড়া থেকে লোকে লাফিয়ে পড়ে মাটিতে। এ আর কী এমন কঠিন কাজ? আমি চেষ্টা করলাম, মাটি থেকে কী করে ছুটন্ত ঘোড়ায় চড়া যায় লাফিয়ে।
মাঝখানে নীরু জিজ্ঞেস করল– পারলেন?
– কী যে বলিস বোকার মতো? প্রথম বারেই সাক্সেল।
জিজ্ঞেস করলাম– সাক্সেল কী?
– তোরা দেখছি ইংরেজিরও কিচ্ছু জানিস না। সাক্সেল মানে সটাং করে পেরে গেলাম, বুঝলি?
আমরা এ ওর মুখ চাওয়া চাওয়ি করলাম। শুরু করলেন আবার–

– তেমনি, গাছ থেকে লাফিয়ে পড়া তো সহজ। সবাই যেটা করে আমি সেটা কেন করব? তাই চেষ্টা করলাম মাটি থেকে উঁচু গাছে লাফিয়ে উঠতে। পারলাম। একবার মাত্র একটু ছাল গিয়েছিল। এভাবে তালিম নিলাম আমি। সে বছর আমি আর জহর, মানে জহরলাল নেহেরু, জেলের দেয়াল টপকে পালিয়ে এলাম। জহর ছিল আমার প্রিয় বন্ধু। ইন্দিরা তখন ছোট। ইন্দিরা গান্ধী। নাম শুনেছিস তো?

আমরা মাথা কাৎ করে 'হ্যাঁ' জানালাম।

– আমাকে কাকা বলতে ও ছিল অজ্ঞান। কাকারে কাকারে বলে কোলে উঠত এসে। কত পেচ্ছাব করেছে কোল ভরে! সে যাই হোক, জেল পালিয়ে উঠলাম এসে দিল্লি এক্সপ্রেসে। কলকাতা আসব। ট্রেনের আবছা আলোয় এক মহিলাকে দেখি সোনাদানায় মোড়া। হার, চেইন, দুল, নাকছাবি ইত্যাদি মিলিয়ে সোনার গয়না তার সারা গায়ে আধামনের কম হবে না। হাত নিশ্‌পিশ্‌ করতে লাগল। জহরকে ইঙ্গিত করলাম। একটু পরেই, ট্রেন যখন ঝড়ের বেগে ছুটতে লাগল, আমরা দু'জন দু'দিক থেকে গয়না ধরে দু'দরজা দিয়ে উল্কার মতো লাফিয়ে পড়লাম রাস্তায়। পরে দেখি, একটা দুলের সাথে মহিলার একটা কানের লতি চলে এসেছে। কার কান জানিস? পরদিন পত্রিকায় দেখি, নোবেলবিজয়ী মাদার তেরেসার কান ছিঁড়ে গহনা নিয়ে ডাকাত উধাও। মহিলাকে চিনতে পারলে এ কাজ আমরা কখনও করতাম না। সত্যি বড় অন্যায় করেছিলাম সেদিন।

একটু থেমে জিজ্ঞেস করলেন–

– মাদার তেরেসা কে জানিস? তোরা তো কিছুই জানিস না দেখি? যত্তোসব বুদ্ধুর দল? বুদ্ধ কে জানিস? গৌতম বুদ্ধ। একসাথে ডাংগুলি খেলতাম। পরে একদিন সমাজ সংসার ছেড়ে, বিবাগী হয়ে চলে গেল বনে। রাজার ছেলে, খাবে সোনার থালে, তা না, চলে গেল জঙ্গলে। এমন বোকা কজন থাকে? কত বুঝালাম, শুনল না। যাবার সময় এই ইকোনো কলমটা আমাকে দান করে গেছে (পকেট থেকে বের করে একটা কলম দেখালেন)। কিচ্ছুই জানিস না? যত্তোসব ঠুটো জগন্নাথ দেখছি তোরা সবাই! জগন্নাথ কে তা জানিস? কী করে জানবি? পুরী যাস্‌ নি তো, কী করে দেখবি জগন্নাথের মন্দির? ও, যে কথা বলছিলাম, মাদার তেরেসা হচ্ছেন একজন নিঃস্বার্থ সেবিকা। মাদার অর্থ কী, বল তো?

সমস্বরে বলে উঠলাম আমরা– মা।

– হ্যাঁ, ঠিক বলেছিস। তবে মাদার তেরেসা হলো তোদের মা। আমাদের সিস্টার। মানে বোন। একই সাথে কাজ করতাম তো! মানুষ আর দেশের সেবার জন্যে প্রচুর টাকার দরকার। তো সেই টাকা সংগ্রহের জন্যেই তখন আমরা ডাকাতি করতাম। তেরেসা অবশ্য নিষেধ করত। সেদিন ট্রেনে আসলে ওকে চিনতে পারি নি। রাত তো? তাছাড়া ওই বগিতে আলো ছিল না বিশেষ। তাই সেইম সাইড হয়ে গেছে।

আরও কত কী যে বলতেন ভদ্রলোক, কে জানে? এমন সময় সামনের টেবিলে এক খদ্দেরের সামনে দু'টো রসগোল্লা চলে এল। তাই দেখে দুর্গদাসবাবুর জিভে জল এমে গেল। তাড়াতাড়ি তিনি বললেন–

– ভজা, আমাকে দু'টো রসগোল্লা দে তো, একটু চেখে দেখি কেমন হয়েছে।

ভজা বলল– তার আর দরকার নাই। রসগোল্লা মিষ্টিই হয়েছে! আমরা চেখে দেখেছি। পকেটে নেই ফুটো কড়ি, খেতে চায় লক্ষ্মীবিলাসের বড়ি।

ভাব বেগতিক দেখে ঠোঁটে দ্রুত মৃদু হাসি এনে ভদ্রলোক বললেন–

– সে কি আর জানি না? মিষ্টি কি আর মিষ্টি লাগে না? মিষ্টি কি আর নোন্‌তা লাগবে? নাকি তেতো লাগবে? এই একটু রসিকতা করছিলাম আর কী? (অমনি কথা ঘুরিয়ে বললেন) বলতো ছোক্‌রারা, রসনা কাকে বলে?
আমরা সব নিশ্চুপ। কারণ, অর্থটা জানা ছিল না।
– পারলি না? রসনা মানে জিভ। বলতো, জিভ কেন রসনা হলো? (জিভটা বের করে দেখালেন) দেখেছিস কেমন টস্‌টস্‌ করছে! রসে একেবারে টইটম্বুর। অর্থাৎ, সুস্বাদু খাদ্যবস্তু দেখলেই জিভে জল আসে, জিভের নাম তাই রসনা। অবশ্য, তোদের জিভ জিভই, রসনা নয়। কারণ, রস আসে না।
হঠাৎ করেই বলে উঠলেন–
– এই ভজা, চার আনা দামের এক কাপ চা এনে দে তো, মচমচিয়ে খাই।
বিষয়টি বোধগম্য হলো না। চায়ের কাপ অবশ্য তখন আট আনা করে। বুঝলাম, দুধ চিনি লিকার কম দিয়ে গরম জল মিশিয়ে পূর্ণ এক কাপ চা করে দেবে। কিন্তু মচমচিয়ে খাবে কী করে? বললাম–
– চা খাবেন মচমচিয়ে? কেমন করে?
অদ্ভুত এক হাসি হেসে বললেন– যত্তোসব গরুর দল, কিচ্ছু বুঝিস না? তোরা তো চা খাস্‌ হুসুৎ হুসুৎ করে, আমি খাই মচমচিয়ে। দেখ তাহলে। দে তো ভজা . . .
দেখলাম, দশ পয়সা দামের শক্ত একটা টোস্ট আর এক কাপ গরম জল দিল ভজা। গরম জলই। দুধ নেই, চিনি নেই, লিকার কম। অর্থাৎ চার আনার মচমচে চা মানে পনের পয়সার চা আর দশ পয়সার টোস্ট। বললেন–
– বুঝেছিস এবার?
কালীগঞ্জের পাঠশালার শিক্ষক এই দুর্গাদাসবাবু। প্রায়ই বলতেন–
– কপাল, বুঝলি, কপাল; নইলে কি আমার আজকে এই পাঠশালায় মাস্টারি করতে হয়? সেই পুরনো আমলের ফ্রি প্রাইমারি পাস; আর মাত্র আট ক্লাস পড়লেই এম.এ. পাস; বুঝলি?
দুর্গাদাসবাবু জ্ঞান দিচ্ছিলেন আমাদের– তোরা তো আর পড়ালেখাই করিস না আজকাল। আমি যা পড়ালেখা করতাম। হ্যারিকেনে কুলোতো না। কখন যে কেরোসিন ফুরিয়ে যেত। তাই আস্ত বিশ লিটারের একটা টিনের মুখ কেটে সলতে বানিয়ে লাগিয়ে দেয়া হতো। সারারাত পড়লেও কেরোসিন শেষ হতো না। আর পড়ার সময় কিছুই খেয়াল থাকত না আমার । ঘরে আগুন লাগলেও টের পেতাম না। একদিন হয়েছে কী পড়তে পড়তে রাত কাবার। সকালবেলা দেখি বাড়ি গমগম করছে লোকে। কী বিষয়? সবাই বলে সে কী, কিছুই জানিস না? কাল রাতে না অমুকের বিয়ে ছিল বাড়িতে। সানাই বাজল, কর্নেট বাজল, নাকাড়া বাজল কিছুই টের পাস নি? আসলে পড়ার সময় অন্য কিছু খেয়ালই থাকে না আমার। টেরই পাই না কিছু।
– আপনি না ছিলেন ক্লাসের ফার্স্ট বয়?
– তবে আর বলছি কী?
– তাহলে ক্লাস ফাইভে খারাপ করলেন কেন? আর এই পাঠশালাতেই বা মাস্টারি করছেন কেন?
– আরে উজবুক শোন তাহলে, ক্লাসে ফার্স্ট হওয়ায় সবাই তাদের বাড়িতে নিমন্ত্রণ করে খাওয়াতে লাগল। কত রকম খাদ্য-খানা! না গেলে আবার বন্ধুরা রাগ করে। ফার্স্ট বয় বলে কথা। প্রায় প্রত্যেক দিনই বেড়াতে

যেতে হয়েছে। পড়ালেখার বিরাট ক্ষতি হয়ে গেল। তাই অগত্যা . . .। কী আর করা? কথায় বলে ম্যান ইজ মর্টাল, কপালের লিখন না যায় খণ্ডন। ভুল ইংরেজি শুনে আর হাসি চেপে রাখতে পারে নি ভোলানাথ।

হঠাৎ একদিন শোনা গেল দুর্গাদাসবাবু ঘোষণা করেছেন– আগামী শনিবার রাত্রি দ্বিপ্রহরে তিনি দেহ রাখবেন। অমাবস্যা তিথি। শনিবার। আর মাত্র তিন দিন বাকি। প্রেমে ব্যর্থ হয়ে কোনো যুবতী গলায় দড়ি দিয়ে মারা গেলে খবরটা যত তাড়াতাড়ি গ্রামে ছড়িয়ে পড়ে, তার চেয়েও দ্রুত গতিতে রটে গেল এ খবর। অমাবস্যার রাতটা বিভীষিকার। তার ওপর শনিবার। একেবারে মাহেন্দ্রযোগ। দাবানলের মতো ছড়িয়ে গেল এ সংবাদ সবখানে।

সেদিন ছিল মঙ্গলবার। আর মাত্র তিন দিন বাদেই দুর্গাদাসবাবু দেহ রাখবেন। লম্পটের মতো চম্পট দিয়ে নেই হয়ে যাবেন। স্মৃতি হয়ে যাবেন। গলায় শুকনো মালাপরা ছবি হয়ে যাবেন। আমাদের স্কুল হোস্টেলের কাছেই কালীগঞ্জ বাজার। আমরা চার-পাঁচ বন্ধু প্রায়ই বীরেনের দোকানে যেতাম চা খেতে, মিষ্টি খেতে, আড্ডা দিতে। সবগুলোই হাফপ্যান্ট। আমি, প্রমথ, কেষ্টা আর পরেশ গেলাম সেদিন বিকেলে। পরেশ অবশ্য লুঙ্গি ধরেছে। তবে তার নিচে প্যান্ট থাকে। কারণ, খুলে খুলে পড়ে যায়। দোকানে ঢোকার আগেই দুর্গাদাসবাবু ডাক দিলেন ভেতর থেকে–

– এই যে পঞ্চপাণ্ডবরা, আয় আয়, একটু কথা বলি। তোদের সাথে কথা বলে সুখ।

বললাম– আমরা তো আজ চারজন। পঞ্চপাণ্ডব বললেন কেন?

খেপে গেলেন– গোবর্ধন কোথাকার, পাণ্ডবরা পঞ্চ নাকি ছয়জন?

মহাভারতের গল্প আমার জানা ছিল। বললাম– ছয়জনই তো, কর্ণ তো অর্জুন ওদেরই ভাই?

– উল্লুক কোথাকার?

পরেশ– দাদা, উল্লুক কী?

– উল্লুক তুই।

কেষ্টা– তয় গোবর্ধন?

– এখানের সবকটা গোবর্ধন।

প্রমথ – দাদা, পঞ্চপাণ্ডব কে কে ছিলেন?

এবারে একটু শান্ত হলেন। বললেন–

– তাই বল্, পঞ্চপাণ্ডব হলো ভীম, অর্জুন, অনুকূল, সহদেব ও ধৃতরাষ্ট্র।

হাসি পাচ্ছিল ভুল নামগুলো শুনে। ধমক দিলেন–

– এই, চিগাস ক্যান? এতে হাসার কী হলো? রামায়ণ পড়েছিস্? রামায়ণ? রামায়ণে সব লেখা আছে।

এবার আরও হাসি পেল। মহাভারতের কথা লেখা থাকবে রামায়ণে? বললাম–

– আপনি পড়েছেন রামায়ণ?

– পড়ি নি মানে? ষাট হাজার বছর আগে পড়েছি। এখনও মুখস্থ। শুনবি? শোন্, দুষ্টুমতি লঙ্কাপতি, হরে নিলো সীতা-সতী . . . কী বুঝলি? বল?

কতক্ষণে শেষ হতো এ বিতর্কের তার ঠিক কী? এক খদ্দের এসে বসল পাশের টেবিলে প্লেটে চারটি মিষ্টি নিয়ে। সাথে সাথে চক্‌চক্ করে উঠল দুর্গাদাসবাবুর দু'টো চোখ। রসগোল্লার মতো গোল। জিভটা বের করলে দেখতে পেতাম রস টলটল করছে তাতে। কথা বন্ধ। চামচে কেটে কেটে রসগোল্লা খাচ্ছে লোকটা। দুর্গদাসবাবুর দৃষ্টিও ওঠানামা করছে চামচের সাথে সাথে। যেন অন্যের মিষ্টি খাওয়া দেখার জন্যই তিনি জন্মেছেন। যেন অন্যের খাওয়া দেখার জন্যই তিনি রোজ এসে বসে থাকেন এ দোকানে। দেখে কেমন কষ্ট লাগল আমার।

গরিব এক পাঠশালার মাস্টার। গুটিকয়েক ছাত্র। লজিংএ থেকে চলে যায় কোনোমতে। বাড়ি যশোর না কোথায় যেন। অজানা। নানা জনশ্রুতি আছে তার সম্বন্ধে। কেউ বলে ডাকাত ছিল। পুলিশের ভয়ে পালিয়ে থাকে। কেউ বলে জেলখাটা দাগি আসামি। কেউ বলে রাজনীতি করত। নকশাল। কেউ বলে বউদির সাথে প্রেম ছিল। দাদাকে খুন করে পালিয়ে এসেছে। কেউ কোনোদিন তার খোঁজও করতে আসে নি এখানে। সকাল-সন্ধ্যা দু'মুঠো খেয়েপরে কোনমতে চলে যায় তার দিন। তাই রসগোল্লা দেখা হয়, খাওয়া হয় না কোনোদিন। বড় করুণা হলো আমার। উঠে গিয়ে ভজাকে বললাম–

– ভজা, দুর্গাদাসবাবুকে প্লেটভর্তি মিষ্টি দে। পেট ভরে মিষ্টি খাওয়াবি। যত পারে। দাম আমি দেব।

ভজার চোখ ছানাবড়া– বলেন কী দাদা? শুধু শুধু . . .

থামিয়ে বললাম– যা বলছি কর্।

আবার এসে বসলাম দুর্গাদাসবাবুর পাশে। একটু পরেই ভাত খাওয়ার একটি বড় চিনেমাটির প্লেট ভর্তি করে মিষ্টি এনে ভজা রাখল দুর্গাদাসবাবুর সামনে। তিনি যেন স্বপ্ন দেখছেন! বলে উঠলেন–

– এ . . . মিষ্টি . . . কাকে . . . এত্তো . . . ?

বললাম – খান আপনি। আজ আপনাকে পেট ভরে মিষ্টি খাওয়াব আমি।

দেখলাম চোখ দু'টো জলে ভরে এল। ভারি গদগদ হয়ে তিনি বললেন–

– সত্যি তুই ভালোরে! এমন করে কেউ কখনও আমাকে খাওয়ায় নি। কবে যে রসগোল্লা খেয়েছি, আজ আর তা মনে নেই। সেই ল্যাংটোবেলায়। রসগোল্লার স্বাদটাই ভুলে গেছি।

প্রসঙ্গ পাল্টাতে বলে উঠলাম– আপনি নাকি উঠে যাচ্ছেন আগামী শনিবার?

খেতে খেতেই বললেন– হ্যাঁরে, যাই। এখানকার পাট এবার চুকিয়ে দেব। কাজ শেষ। অনেক তো হলো? আর কত?

ফট করে প্রশ্ন করে বসল কেষ্টা– কোথায় যাবেন দাদা?

নির্লিপ্ত উত্তর দিলেন– মঙ্গলগ্রহে।

একটু থেমে, আর দু'টো রসগোল্লা হাপিস্ করে দিয়ে বললেন–

– ডাক এসে গেছে। পরপারের ডাক। এবার কেটে পড়ব। তোদের যদি আমাকে কারো কিছু খাওয়ানোর ইচ্ছে থাকে, এ কদিনের মধ্যেই সেরে ফেল। সুযোগ পাবি না আর নয়ত।

আমাদের মধ্যে পরেশটা একটু পোংটা। বলে উঠল– মঙ্গলে গিয়ে খাইয়ে আসব দাদা।

কঠিন দৃষ্টি ছুঁড়ে খাওয়ায় মনোনিবেশ করলেন দুর্গাদাসবাবু।

বারো মাঘ। শনিবার। অমাবস্যা তিথি। সকাল থেকে স্টেজ বাঁধা চলছে দুর্গাদাসবাবুর লজিং বাড়িতে। এক পাশে গ্রিনরুম। শামিয়ানা টাঙানো হচ্ছে। হ্যাজাক লাইট ঠিক করা হচ্ছে। কলাগাছ পুঁতে গেট সাজানো হচ্ছে। ছোটখাটো একটা মেলা বসে গেছে বাড়ির চারপাশে। ছোট ছোট মিষ্টির দোকান, খিলিপানের দোকান, চানাচুরের দোকান, খেলনার দোকান বসে গেছে বেশ কিছু। খাবার দোকানও বসেছে। ডিম সেদ্ধ করে লাল রঙ মিশিয়ে সারি সারি করে ভেজে রাখা হয়েছে। এসেছে চায়ের দোকান। জুয়ার আসরও বসেছে কয়েকটা। মেলার মাঠের এক কোণায় ছোট্ট একটা হোটেলও বসেছে। মোটা কাগজে লাল অক্ষরে বড় বড় করে কাঁচা হাতে লেখা নাম 'ছ্রি ছ্রি আদর্স হিঁন্দু হৌডাল'। এক পাশে একটা নাগরদোলাও বসেছে। মহা আয়োজন।

বাড়ির বিরাট স্টেজটা মনে হয় রূপবান যাত্রার আসর। অথচ ওই মঞ্চে শুয়েই দেহত্যাগ করবেন মহাত্মা দুর্গাদাস পণ্ডিত। নামকীর্তন গানের আসর যেভাবে সাজায় লাল, নীল, সবুজ কাগজ কেটে কেটে লতা পাতা ফুল এঁকে, সেভাবে সাজানো হয়েছে স্টেজের উপরটা। চারদিকে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে লেখা হয়েছে– শ্রী শ্রী দুর্গাদাস পণ্ডিতের মহান দেহত্যাগ অনুষ্ঠান। মাইকে গান বাজছে– আমি যদি মরি, ও হরসুন্দরী, দুর্গা নাম তো কেউ লবে না। . . . তুমি চলে গেলে, চেয়ে চেয়ে দেখলাম, আমার বলার কিছু ছিল না। . . . তোমার বাড়ির সামনে দিয়ে আমার মরণযাত্রা যেদিন যাবে। . . . আমার যাবার সময় হলো দাও বিদায়। . . . তুমি আর ডেকো না, পিছু ডেকো না, আমি চলে যাই, শুধু বলে যাই, তোমার হৃদয়ে মোর স্মৃতি রেখো না। . . . কথা দাও আবার আসবে। . . . আবার হবে তো দেখা, এ দেখাই শেষ দেখা নয় তো। . . . জীবনে যদি দীপ জ্বালাতে নাহি পারো, সমাধি পরে মোর জ্বেলে দিও। . . . মরমিয়া তুমি চলে গেলে, দরদি আমার কোথা পাব। . . . ইত্যাদি ইত্যাদি গান। এই দেহত্যাগ অনুষ্ঠান উপলক্ষে বেছে বেছে এ ধরনের কতগুলো গান একত্রে ক্যাসেট করা হয়েছে। ভুলে তার ভেতর এই গানটাও কীভাবে যেন ঢুকে গেছে– প্রেম একবারই এসেছিল নীরবে . . . ।

দুর্গাদাসবাবুর দেহত্যাগ উপলক্ষে আমাদের স্কুল একদিনের ঐচ্ছিক ছুটি ঘোষণা করা হয়েছে। শুধু মৃত্যুর দিন। ইচ্ছামৃত্যু কমিটি গঠন করা হয়েছে। নাম দেয়া হয়েছে– শ্রী শ্রী দুর্গাদাস পণ্ডিতের দেহত্যাগ অনুষ্ঠান পরিচালনা পরিষদ। এ কমিটির সভাপতি আমাদের স্কুলের হেডমাস্টার খগেন্দ্রনাথ কুলপতি। স্কুল তাই ছুটি। কী যে আনন্দ আমদের! আমরা কয়েকজন ইচ্ছামৃত্যু কমিটির ভলান্টিয়ার। সাদা টুপি। হাতে বাঁধা লাল ফিতা। মনে মনে ধন্যবাদ দিতে লাগলাম দুর্গাদাসবাবুকে। কারণ, তিনি না মরলে স্কুল ছুটি হতো না। এই মহোচ্ছবটা হতো না। এত বড় মেলা বসত না। মাইকে সুন্দর সুন্দর প্রেমের গান বাজাত না। ফুটফুটে মেয়েরা আসত না। মনে মনে একটু প্রেম প্রেম ভাবও জাগত না। মনে মনে অজস্র ধন্যবাদ জানাতে লাগলাম দুর্গাদাসবাবুকে।

আমরা চার-পাঁচজন দুর্গাদাসবাবুর প্রধান সাগরেদ। সারাক্ষণ আছি তার কাছাকাছি। চারদিক থেকে লোকজন আসতে শুরু করেছে ইতোমধ্যেই। সবারই বিস্ময়– কী ভাবে মরবে! সবাই-ই এক পলক চোখের দেখা দেখতে চায় . . . এক পলকে একটু দেখা . . . এরকম একটা ব্যাপার। বেলা দ্বিপ্রহর। দুয়ারে প্রস্তুত নেই

গাড়ি। লোকে লোকারণ্য। ওড়াকান্দির মেলার মতো গিজগিজ করছে মানুষ। পরেশ বলল– গণেশ পাগলের মেলার মতো। মানুষ নয়, ভক্তবৃন্দ। এমন সময় দুর্গাদাসবাবু হাঁক দিলেন–

– এই কেষ্টা, এই বেষ্টা, আয় তো . . . একটু চল দেখি, মেলা ধর্ষণ করে আসি।

আমরা তো মহা খুশি। তিনি আগে আগে। সক্রেটিস। পেছনে আমরা প্লেটো, এরিস্টটল। চেলার দল। কোথাও কোথাও তিনি নিজেই তদারকি করছেন। চেয়ার টেবিল পেতে কলেজ পড়ুয়া এক ছাত্র বসে আছে মূল গেটের কাছে। লাইনটানা লম্বা বড় একটা রঙিন জাবেদা খাতা টেবিলের উপর। উপরে লাল কালিতে মোটা করে লেখা– শোক বহি। লম্বা একটা সুতোর এক প্রান্তে বাঁধা একটা কালো বলপেন। অন্য প্রান্ত টেবিলের পায়ার সাথে বাঁধা। পেছনে বড় বড় করে লেখা– দয়া করে আপনার মন্তব্য লিখুন।

সেদিকেই গেলেন তিনি। উনি সামনে যেতেই ছেলেটা দাঁড়িয়ে গেল। তিনি বললেন–

– দাও তো খাতাটা। আমার মন্তব্যটা আমি লিখে রেখে যাই। জীবনের শেষ লেখা।

লিখলেন– কা তব কান্তা। ওই তো শ্মশান দেখা যায়। তুমি আমি সব আলোর বুদ্বুদ। চিতার ফুলকি। একটু পরেই আমি ফক্কা। সর্বে ভবন্তু সুখীনো, সবাই সখী হও। ওঁ শান্তি।

লিখে ভাবলেন, দু'একটা মন্তব্য পড়ে দেখি কে কী লিখেছে ইতোমধ্যে। উপরের মন্তব্যটা দেখেই কান গরম। লিখেছে– 'শালা ত্যান্দর কোথাকার; ভড়ং আর কাকে বলে? এর উপরেরটা লেখা– 'মাইরি, মহাবুজরুক ...'। আর পড়লেন না। আর পড়া যায় না। আমাদের দিকে তাকিয়ে বুঝতে চেষ্টা করলেন আমরা দেখে ফেলেছি। খাতা বন্ধ করে দ্রুত পা চালালেন মেলার দিকে। এর চেয়ে মেলা দেখা ভালো।

শুরু হলো মেলা দেখা। সে এক মহাকাণ্ড। তিনি ঘুরে ঘুরে দেখছেন। আমরা পেছন পেছন হাঁটছি। দূর থেকে লোকজন আঙুল দেখিয়ে বলছে– 'ওই, ওই যে লোকটা'। কেউ কেউ সাথে সাথে হাঁটছে। কেউ কাগজ এগিয়ে দিচ্ছে– 'দাদা, একটা অটোগ্রাফ'। সে এক মহাবিব্রতকর অবস্থা। আমার অবশ্য বেশ মজাই লাগছিল। ডিমের দোকানের সামনে দাঁড়ালেন তো দোকানদার একটা ডিম এগিয়ে দিলেন। চানাচুরের দোকানদার একমুঠো চানাচুর। মিষ্টির দোকানদার দু'টো মিষ্টি। প্রতি দোকানে দাঁড়াতেই কিছু না কিছু দিচ্ছে খেতে। উনিও খেয়ে যাচ্ছেন। যেন খান নি কখনও কিছুই। আবার বলছেন– বেশি দিও না। সব দোকানে আর খেতে পারব না তাহলে। সকলের মন রাখতে হবে তো?

দোকানিরা বলছে– সে কী দাদা, আপনি একটু খেলে যে আমাদের পুন্যি!

আমরা ভাবছি অন্য কথা। এত খেলে, রাত দুপুরের আগেই তো উনি পটল তুলবেন ডায়রিয়া বাঁধিয়ে। কে শোনে কার কথা? তিনি হাঁটছেন। থামছেন। খাচ্ছেন। আবার হাঁটছেন। পেছনে সৃষ্টি হয়েছে বিরাট এক বাহিনী। এক ফাঁকে বলে উঠলেন– হ্যারে কেষ্টা, এত আয়োজন দেখে মরতে ইচ্ছা হচ্ছে না। সবাই কত ভালোবাসে আমাকে। মরে গেলে এসব তো আর পাব না কোনোদিন। এখন তো আর কোনো উপায় নাই। গুলী বেরিয়ে গেছে বন্দুকের নল দিয়া। আর ফিরানোর উপায় নাই।

হাঁটতে হাঁটতে নাগরদোলার সামনে এসে উপস্থিত। থামলেন। তাকিয়ে তাকিয়ে দেখলেন কিছুক্ষণ। তারপর বললেন– বাঃ চমৎকার! উঠছে, নামছে। ওঠা-নামাটাই একমাত্র সার। পৃথিবীটাই একটা নাগরদোলা। পয়সাও দাও, ঘুল্লাও খাও। বল তো, নাগরদোলা মানে কী?

বস্তুত অর্থটা আমাদের জানা ছিল না। তাই পরস্পরের মুখ চাওয়া-চাওয়ি করতে লাগলাম। উনি বললেন–

– ওরে সারমেয়র দল, এইটেই জানিস্ না? নাগর মানে প্রেমিক। প্রেমিক-প্রেমিকা যে দোলায় চড়ে ঘুল্লা খায়। কিন্তু এখন চড়ে শুধু বাচ্চারাই। আমি কখনও চড়ি নাই। আমারতো নাগর নাই'।

মনের মধ্যে একটু লজ্জা লজ্জা ভাব জাগল। আবার প্রেম প্রেম একটু দোলাও লাগল। নাগর কথাটা কানের মধ্যে না ধরা টেলিফোনের মতো ক্রিরিং ক্রিরিং করে বাজতেই লাগল।

প্রমথ বলে উঠল– সারমেয় কী দাদা?

– সারমেয়?

এটুকু বলেই চুপ মেরে গেলেন। মনে হলো অর্থটা জানেন না তিনি। আন্দাজেই বলে ফেলেছেন। তাই অন্য প্রসঙ্গের অবতারণা করলেন। উত্তর না পেয়ে আবার জিজ্ঞেস করল প্রমথ– সারমেয় কী তাহলে দাদা?

– সারমেয় হচ্ছে . . . এই সারমেয় . . .

ক্ষেপে গেলেন হঠাৎ– এই সামান্য অর্থটা পর্যন্ত জানিস্ না তোরা; তোদের আর কী শেখাব? তোদের হেডমাস্টারকে গিয়ে জিজ্ঞেস করিস্।

দ্রুত প্রসঙ্গ পাল্টিয়ে বললেন– এই, নাগরদোলায় চড়বি? কোনোদিন চড়ি নাই কিনা? আজ তো শেষ দিন। তাছাড়া, মাগনা!

উঠে পড়লাম আমরা সবাই মিলে। ক্যাঁচর ক্যাঁচর শব্দ তুলে দু'ঘুল্লা না দিতেই– কেষ্টা, বেষ্টা, থামা, থামা; থামাতে বল ওরে বাবা, বিশ্ব ঘুরছে– চিৎকার করে উঠলেন দুর্গাদাসবাবু। থামল। ঝপাং করে নেমেই চিৎপটাং দিয়ে শুয়ে পড়লেন ঘাসের উপর। লোকজন জড়ো হয়ে পড়ল। ঘিরে ধরল চারদিক। দুর্গাদাসবাবু বুঝি এখনই যায়। না। গেলেন না। একটু পরেই চোখ মেলে তাকালেন। বললেন– আমি কোথায়? মঙ্গলগ্রহে?

পরেশ বলল– আজ্ঞে না, পৃথিবী আর মঙ্গলগ্রহের মাঝামাঝি।

সন্ধে হতেই লোকে লোকারণ্য। নারী-পুরুষ, কিশোর-কিশোরী, ছেলে-মেয়ে, যুবক-যুবতী, বুড়া-বুড়ি, সাধু-সন্ন্যাসী, চোর-গুণ্ডা, চেনা-অচেনা, আত্মীয়-অনাত্মীয়, হিন্দু-মুসলিম, বৌদ্ধ-খ্রিস্টান, কৃষক-ব্যবসায়ী, ছাত্র-শিক্ষক-কর্মচারী– সব শ্রেণির লোক এসে হাজির বিনা নিমন্ত্রণে। সে এক বিতিকিচ্ছিরি মহোচ্ছব। মঞ্চের পাশেই ঝুলানো হয়েছে বিরাট এক দেয়াল ঘড়ি। চারপাশে চারজন বসে গেছেন যথাক্রমে গীতা, উপনিষদ এবং রামায়ণ-মহাভারত পড়তে। নিচুস্বরে পড়ছে মন্ত্রের মতো। সব মিলিয়ে পরিবেশটা না বিয়ে বাড়ি, না শ্রাদ্ধের বাড়ি। না কীর্তনের আসর, না যাত্রার আসর। আবার সবগুলোই একসাথে। বিছানা পাতা হয়েছে মঞ্চের ওপর। নতুন তোশক, নতুন চাদর, নতুন লেপ, নতুন বালিশ। ধপধপে সাদা বিছানার ওপর ছিটিয়ে দেয়া হয়েছে গোলাপ পাপড়ি। বিছানার চারপাশে দু'ইঞ্চি ফাঁক ফাঁক জ্বলছে মোমবাতি। কেবল পায়ের দিকে বিঘত খানেক ফাঁকা। মোম নেই। ওই পথেই তিনি ঢুকবেন। পুবদিকে মাথা দিয়ে শিবের মতো চিৎ হয়ে তিনি শোবেন। শুধু শ্যামা মা নাচবে না বুকে। থাকতেও এখন তিনি নেই হয়ে গেছেন। ওই দেহটা একটু পরে শব

হয়ে যাবে। টুস্ করে বেরিয়ে যাবে প্রাণপাখি। আর আসবে না। আসবে না। খাঁচাটা পড়ে রবে শূন্য। মোমবাতির ফাঁকে ফাঁকে ধোঁয়া ওড়াচ্ছে আগরবাতি। গন্ধে কেমন ম ম করছে চারদিক। বেশ একটা কায়দা। মহান মৃত্যু সম্বন্ধে জ্ঞানগর্ভ বক্তৃতা দিলেন সমাজের বিশিষ্ট ব্যক্তিরা। শেষে উঠলেন খগেন্দ্রবাবু। তিনি মহাত্মা-পুণ্যাত্মা নানা প্রশংসাসূচক শব্দ ব্যবহার করে শেষ করলেন তাঁর বক্তব্য। শোনা গেল ঢং ঢং করে রাত এগারোটা বাজল দেয়াল ঘড়িতে । শঙ্খধ্বনি হলো । মেয়েরা উলুধ্বনি দিল। তিনি আসছেন। সাদা ধুতি, সাদা পাঞ্জাবি। কপালে তিলক- চন্দন। গলায় বড় একটা রঙিন কাগজের মালা। যেন গাবতলীর কোরবানির হাট থেকে সদ্য কিনে আনা। ঠোঁটে ঝুলছে একখানা মোনালিসা মার্কা হাসি। বুকের কাছে নমস্কারের ভঙ্গিতে জোড় করা হাত। ধীর পদক্ষেপে মঞ্চে প্রবেশ করছেন তিনি। নিস্তব্ধ সারা বাড়ি। টু শব্দ নেই কারো মুখে। মঞ্চের মাঝখানে এসে দাঁড়ালেন তিনি। মুখ খুললেন– হে বিশ্ববাসী, আর একটু পরেই আমি ফক্কা। উঠে যাব। নেই হয়ে যাব। এই যে দেহটা দেখছেন, চিমটি কাটলে এখনও ব্যথা লাগে। থাকবে পড়ে। কিন্তু ভেতর থেকে আমি চড়ুই পাখির মতো ফুড়ুৎ। মরার সময় একদিন রাবণ বলেছিলেন– I to die , you to live; but which is better only God knows. সবাই সুখী হউন।

তিনি আসন গ্রহণ করলেন। আসন বলা বোধ হয় ঠিক হলো না। শয্যা গ্রহণ করলেন। চিৎ হয়ে শবাসনে শুলেন। এইবার দেহ রাখবেন। দেহ ছেড়ে সটাং করে বেরিয়ে চলে যাবেন। আমি তার প্রধান সাগরেদ বনে গেছি। এক পেট মিষ্টি খাওয়ানোর ফলে সম্ভবতঃ। শিয়রে বসে পর্যবেক্ষণ করছি আমি কোন সময়, কেমন করে পাখি উড়াল দেয়। তিনি চোখ বুঁজলেন। কিন্তু পিট পিট করে নড়ছে চোখের পাতা। মরছেন না। সাড়া বাড়িতে মৌচাকের মতো এক ঝিমানো গুঞ্জন।

এক ফাঁকে ঝট্ করে কী যেন মুখে পুরলেন। গিলে ফেললেন। বালিশের নিচে যেন কী একটা লুকোলেন। শালা বিষ খেলো নাকি আবার? কিন্তু প্রতিক্রিয়া দেখা দিল না কোনো। তাই বুঝতে পারলাম না। ঘণ্টাখানেক বাদে বললেন– বিষ্টুরে, বেগ দিচ্ছে। পায়খানায় যাব।

ভাবলাম– এই সেরেছে। কর্তৃপক্ষকে জানালাম । সাথে সাথে মাইকে ঘোষণা হলো–

– সমবেত জনতা, মহাত্মা দুর্গাদাস পণ্ডিত জীবনের শেষবারের মতো মলত্যাগ করিবার সদিচ্ছা ব্যক্ত করিয়াছেন। তাই তিনি কিছুক্ষণের জন্য মৃত্যুশয্যা পরিত্যাগ করিয়া পবিত্র বিষ্ঠা উৎসর্গের নিমিত্ত পুকুরপাড় অবস্থান করিবেন।

তিনি চলে গেলে আমার মনে একটা ফন্দি এল। বালিশের তলায় কী লুকিয়েছেন? বসলাম গিয়ে বিছানায়। হাতড়িয়ে বের করে আনলাম ওষুধের খোসা। পড়ে দেখলাম সিডাক্সিন ৫ মি.গ্রা.। ঘুমের ওষুধ। তাহলে এই? খোসাটা ফেলে দিলাম। কারণ, লোকে জানতে পারলে কেলেঙ্কারি হয়ে যাবে। উনি ফিরে এলেন পুকুরপাড় থেকে। শুলেন আবার। বিড়বিড় করে বললেন–

– দাস্ত হয়েছে বেষ্টা। মেলায় সব দোকানে অত কিছু খাওয়া ঠিক হয় নি। আবার যদি বেগ পায়?

বললাম– মৃত্যুশয্যাতেই মেরে দেবেন।

– মৃত্যুপথযাত্রীর সাথে রসিকতা করিস্?

– রসিকতা তো আপনি করছেন সবার সাথে?

গায়ের ঝালটা ঝাড়লাম কিছুটা। খানিক থেমে নিচু স্বরে বললাম– তা সিডাক্সিন কয়টা খেয়েছেন?
চমকে উঠলেন– এ্যা, তুই টের পেলি কী করে হারামজাদা?
– জানি। কয়টা খেয়েছেন?
– আগে চারটা। তা ঘুমও আসে না। তাই আরও চারটা। তাতেও কাজ হচ্ছে না রে! এখন উপায়? শেষে কি জাত-কুল যাবে নাকি রে?
– না। কথার আপনার নড়চড় হবে না। আজ আপনি মরবেনই। যখন কোনো ভাবেই মরবেন না, তখন লোকে ভণ্ড ভেবে কিলিয়ে কাঁঠাল পাকাবে। এরপর আর বাঁচার সম্ভাবনা থাকবে না আপনার।
ভয় পেয়ে গেলেন।
– তাই! ওরে বাবা, ও ভাবে কিল খেয়ে মরতে পারব না। ওতে বেশ ব্যথা। একবার চুরি করে ধরা পড়ে কিল খেয়েছিলাম অনেক। সে কী বিষ! সেই থেকে ভাবছি আর যা-ই খাই, কিল খাব না।
– তাই তো, তাহলে কী ভাবে মারা যায় আপনাকে?
– ফন্দি একটা বের কর শিগ্‌গির্।
এমন সময় যমদূতের মতো কক্‌ড়ড়ড় কক্‌ড়ড়ড় শব্দে দ্বিতীয় প্রহর ঘোষণা করলেন বাজপাখি। দেয়াল ঘড়ি ঢং ঢং করে দু'বার বাজল। এই সেই মাহেন্দ্রক্ষণ, যখন দুর্গাদাসবাবু দেহ রাখবেন। কিন্তু দুর্গাদাসবাবু মরছেন না। ফস্ করে আমার একটা হাত দু'হাতে চেপে ধরে বললেন–
– ভাইরে, তুই আমারে বাঁচা।
মঞ্চে আর কেউ না থাকাতে কেউ শুনতে পাচ্ছিল না আমাদের ক্ষীণ কথাবার্তা।
– বাঁচাব কী? আপনি তো বেঁচেই আছেন?
– বিটলামি করিস্ না। রসিকতা রাখ। এ বাঁচানো মানে মেরে ফেলা। বাঁচা অর্থে কবি এখানে মৃত্যু বুঝিয়েছেন। বুঝিস্ না কেন? তুই একটা কাজ কর ভাই? দোকান থেকে আর গোটা চারেক সিডাক্সিন নিয়ে আয় আমার নামে, বাকি। পরে দিয়ে দেব পয়সা।
– আর চারটা ক্যান, আরও বিশটা খেলেও আপনি মরবেন না।
– কী বলিস্? ওষুধেও কি কোনো ঝাঁজ নেই আজকাল? সব নকল? ভেজাল? ওষুধ কোম্পানিগুলোর বিরুদ্ধে কেস্ করব আমি। শুনছি তো প্রেমে ব্যর্থ হলে প্রেমিক-প্রেমিকারা নাকি সিডাক্সিন খেয়েই মারা যায়? সেই ভেবেই তো আমি আগেভাগে সিডাক্সিন কিনে রেখেছিলাম। ওরা কয়টা করে খায়?
– তার আমি কী জানি? আমি কি মরেছি, না খেয়েছি?
– তুই প্রেম করিস্ নি? জেনে রাখিস্ নি কয়টা খেলে মারা যায়? জেনে রাখা ভালো। ভাই একটু দ্যাখ্ না! খেয়ে মারা গেছে এমন কারও কাছে একটু খোঁজ নিয়ে আয়। আমাকে উদ্ধার কর।
দৃঢ় কণ্ঠে উত্তর দিলাম– আমি পারব না।

ক্রমে ক্রমে রাত ধাইছে ভোরের দিকে। পুব দিকে ফর্সা ফর্সা ভাব। বাজপাখি তৃতীয় প্রহর ঘোষণা করলেন। কিন্তু প্রাণপাখি খাঁচা ছেড়ে পালাচ্ছেন না। দুর্গাদাসবাবু বহাল তবিয়তে জীবিত থাকছেন। ভাবছেন, যদি না-ই মরেন, ঠিকানা খুঁজে মালিককে গিয়ে এই ভুয়া ওষুধ বানানোর জন্য প্রাণ খুলে বকে আসবেন। মামলা করবেন।

ইতোমধ্যে চারদিকের গুঞ্জন হট্টগোলে পরিণত হয়েছে। দুর্গদাসবাবুর ভাবি মৃত্যুসংবাদ শুনে অনেকের মনেই একটু দুঃখ দুঃখ ভাব জেগেছিল। সন্ধের দিকেও লোকজনের মুখে আহাহারে . . . আহাহারে শোনা গেছে। কারও কারও মনে এমন বাসনাও ছিল যে উনি মরলে দু'ফোঁটা অশ্রু বিসর্জন করবে। মৃত্যুর এ অহেতুক বিলম্ব দেখে লোকজনের ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে গেল। সবারই এখন এক প্রশ্ন– দুর্গাদাসবাবু মরেন না কেন?

নানা জনে নানা কথা ছুঁড়ে দিচ্ছে– রাত দ্বিপ্রহরের জায়গায় তো রাত তিন প্রহর হতে চলল! এ কি লোকাল ট্রেনের টাইম নাকি? শালায় ঢং ধরেছে। বুড়া শকুন। বুজরুকি, বুজরুকি।

যাত্রাগানের আসরে, যাত্রা শুরু হতে দেরি হলে উত্তেজিত জনসাধারণ যেমন হাতে তালি দেয়, তেমনি একদল হাততালি দিচ্ছে মাঝে মাঝেই। মাইকে বারবার বলছে– শান্ত ও ভদ্র জনতা, আর একটু ধৈর্য ধরুন। মহাত্মা দুর্গাদাস পণ্ডিত আর অল্প কিছুক্ষণের মধ্যেই দেহ ত্যাগ করিবেন। ধরাধামের মায়া ত্যাগ করিয়া, আমাদের কাছ হইতে চিরবিদায় লইয়া চলিয়া যাইবেন।

দুর্গাদাসবাবু বললেন– বেষ্টা, যা, আর একশো সিডাক্সিন ট্যাবলেট নিয়ে আয়। সবার কাছে আমি মিথ্যা হয়ে যাব? তা পারব না।

রাগ হচ্ছিল প্রচণ্ড আমার। বললাম– সারা জীবন তো মিথ্যেই বলে আসছেন? আজও না হয় বললেন?

– আঃ, তলে পড়ে আবার চিমটি কাটিস্? পচা ঘায়ে আর চাটা দিস্ না।

আচমকা এ সময় তিনি বলে উঠলেন–

উঃ বাবা, বেগ দিয়েছে। বেষ্টা, আবার যাব। শিগ্গির্ ধর্। পুকুরপাড় চল।

সুইসাইড

আজই তার সুইসাইড করার কথা। আজ সাতাশে শ্রাবণ মঙ্গলবার ভরা পূর্ণিমায় তার তিরোধান। স্বেচ্ছামৃত্যু। মৃত্যুর অনেক কারণ, কিন্তু উপায় মাত্র একটা। 'যত মত তত পথ' নয়, বহু পথ কিন্তু গন্তব্য এক। অনেক নদী কিন্তু গন্তব্য একই। সমুদ্র। মৃত্যুর পদ্ধতি সম্পর্কে কোনো সিদ্ধান্তে পৌঁছতে সমর্থ হয় নি এখনও। ইচ্ছে যে ক'টিই থাক, মৃত্যুর পদ্ধতি একটাই বেছে নিতে হবে। বারবার তো আর মরা যাবে না। বারবার মরে কাপুরুষেরা। মনে মনে সে ভেবে রেখেছে বিষপানে আত্মহত্যা, ঘুমের ট্যাবলেট খেয়ে আত্মহত্যা, গলায় দড়ি দিয়ে অর্থাৎ শুদ্ধ বাংলায় উদ্বন্ধনে আত্মহত্যা, রিভলবারের গুলীতে আত্মহত্যা, নদীতে ঝাঁপিয়ে পড়ে কিংবা বহুতল ভবনের ছাদ থেকে লাফিয়ে পড়ে আত্মহত্যা অথবা গাড়ির তলে পড়ে আত্মহত্যা– অনেকগুলো পথ আছে। তবে ফাইনাল ডিসিশনে এখনও পৌঁছতে পারে নি সে। অনেক ভেবেছে এ বিষয়ে। যেটা রাজকীয় এবং শান্তিপ্রিয়, সেটাই বেছে নেবে। কিন্তু সবগুলোতেই কোনো না কোনো একটা সমস্যা রয়েছে। জটিলতা আছে। নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা নেই কোনোটাতেই। এটাও ভেবে রেখেছে– সিদ্ধান্তে পৌঁছতে না পারলে লটারি করবে। লটারিতেই বেছে নেবে সুইসাইডের পদ্ধতি। লটারি মানেই নিরপেক্ষতা। সুইসাইড পদ্ধতি নির্বাচনে নিরপেক্ষতা। বিষয়টি নিঃসন্দেহে গণতান্ত্রিক।

এক সপ্তাহ আগে শোনা গেল লোকটা সুইসাইড করবে এক সপ্তাহের মধ্যে। পৃথিবীতে বেঁচে থাকার কোনো অর্থই সে খুঁজে পাচ্ছে না। জীবনের ভার সে আর বহন করতে পারছে না। নাকের উপর মনে হয় আড়াই কেজি ওজনের বাটখারা। নিজেকে ভারবাহী গাধা ছাড়া আর কিছুই মনে হয় না তার। পৃথিবী তার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে। জোঁকের মতো জীবন। মানুষ তাতে নুন ছিটিয়ে দিয়েছে। অগত্যা তার সুস্পষ্ট ঘোষণা– যা থাক কপালে এক সপ্তাহের মধ্যেই সুইসাইড।

বিকেলবেলা হাঁটার ফাঁকে পার্কের বেঞ্চিতে একটু জিরিয়ে নেয়া। কিছুটা মেঘলা আকাশ। ঝুপ্ করে নামবে বলে মনে হয় না। ইলশেগুঁড়ি হতে পারে। বন্ধু কিংশুক আর আমি দু'ঠোঙা বাদাম চিবুতে চিবুতে গল্প করছি। রোগামতো একটা লোক সরু লাঠির মতো, যাচ্ছিল পাশ দিয়ে, কালো একটা টুপি পরা। পোশাকে কিছুটা উদ্ভটতা। হাতে দামি মোবাইল সেট। কিংশুক ডাক দিল– আরে জাকির, কেমন আছো?

– ভালো আছি।
– তারপর আর খবর কী?
– এই তো, বাচ্চার বয়স এগারো মাস।
– বাচ্চার বয়স এগারো মাস? বিয়ে করলে কবে?
– বিয়ে করি নি তো?
– বলো কী? তাহলে বাচ্চা এলো কোত্থেকে?
– ওই আগেরটাই আবার ফেরত আসছে।
– তার মানে? আগেরটা, কী আগেরটা?
– আগের বউ।
– এই বললে না, আর বিয়ে করো নি? তাহলে আগেরটা-পরেরটা হয় কী করে?
– ওই একটাই এখন আগেরটা হয়ে গেছে।
– সে তো বহুকাল আগের ঘটনা? উপনিষদের যুগের কথা। তুমি যে বিয়ে করেছিলে, সে তো তুমি নিজেই ভুলে গেছিলে, তাই না?
– তা ঠিক। আবার মনে পড়ে গেল। আবার দেখা হলো। ঝালাই হলো। বোঝাপড়া হলো। এখন চলছে।
– কী চলছে?
– সংসার। দিল্লি কা লাড্ডু।
– বউয়ের সাথে বনিবনা হচ্ছে?
– প্রায়ই হয়।

– প্রায়ই হয় মানে?
– সকালে ঝগড়া হলে বিকেলে বনিবনা, সন্ধেয় ঝগড়া হলে রাতে বনিবনা। সকালে রাধা-বিচ্ছেদ তো বিকেলে কৃষ্ণ-লীলা। প্রতিদিন বেশ কয়েকবার বনিবনা হয়।
– আর বাড়ির খবর?
– আমার বড় ভাইটা একটা অমানুষ। আরমাডিলো। বাড়ি থেকে আমাকে তাড়িয়ে দিয়েছে। ফোনে বলে কিনা তুই বিপত্নীক। বিপত্নীক শব্দের মানে বোঝে? যার মানে বোঝে না, সে কথা বলে কেন? আমি বললাম– আমার স্ত্রী কি মারা গেছে, যে বিপত্নীক বলছো? যার মানে জানো না, তা বলো কেন? যার স্ত্রী চলে যায় স্বামীকে ছেড়ে, তাকে কি বিপত্নীক বলে কিংবা বিপত্নীক বলা যায়? অনেকেই এ রকম শব্দের অর্থ না জেনে বলে ফেলে। বাংলা ঠিকমতো বলতে পারে না, বাংলার অধ্যাপক হয়েছে?
– তোমার স্ত্রী কোথায় এখন?
– আছে ঢাকাতেই।
– তা বড় ভাইকে কিছু বল না কেন?
– আমি তো ইচ্ছে করলে তাকে পিটাতে পারি। কিন্তু পিটাবো না। ন্যাচারাল পানিশমেন্ট বলে একটা কথা আছে না? তার অপেক্ষাতেই আছি। ছোটভাই হয়ে তো আর তার গায়ে হাত তুলতে পারি না। আত্মসম্মান বোধ আছে না? পানিশমেন্ট তার হবেই। আপনাকে একটা কথা বলি– এক সপ্তাহের মধ্যেই আমি সুইসাইড করবো।
– কেন?
– প্রয়োজন আছে।
– প্রয়োজন আছে? প্রয়োজনটা কেমন?
– মানবিক প্রয়োজন।
– সে আবার কী?
– জীবনের ভার আর বইতে পারছি না। নিজেকে গুবরে পোকা বলে মনে হয়।
– এইমাত্রই না তুমি বললে ভালো আছো? এখন গুবরে পোকা হয়ে গেলে?
– একটু আগে ছিলাম। এখন নাই। সুচিত্রা সেন গেয়েছেন না 'ভুল সবই ভুল, এই জীবনের পাতায় পাতায় যা লেখা সে ভুল'?
– সুচিত্রা সেন নয়, সুজাতা চক্রবর্তী।
– ওই হলো। যে-ই পিদিম, সে-ই চেরাগ। সুজাতা আর সুচিত্রা পার্থক্য কী? একজন গাইলেই হলো।
এতক্ষণ মনোযোগ দিয়ে কথাগুলো শুনছিলাম আমি। বলা চলে গিলছিলাম। লোকটাকে আমি চিনি না। তাই কথা বলার প্রশ্নও ওঠে না। পাশে যে আমি একজন মানুষ বসেই আছি লোকটা বোধ হয় তা খেয়ালও করে নি। খেয়াল করলেও গ্রাহ্য করে নি। পার্কের বেঞ্চির পাশে ভাস্কর্য ভেবেছে বোধ হয়। তুচ্ছ পোকা-মাকড় ঠাউরিছে যেনবা। ক্যানভাসারদের মতো আপন মনে কথা বলেই যাচ্ছে। বলেই যাচ্ছে। আমি বললাম– আপনার সাথে আমার পরিচয় নেই। আমি কি তবু দু'একটা কথা বলতে পারি আপনার সঙ্গে?
– কেন পারবেন না? নিশ্চয়ই বলতে পারেন। একশোবার বলতে পারেন। আপনার রাইট আছে কথা বলার। হিউম্যান রাইট। বলেন না?
– আপনার আত্মহত্যার কারণ কী?
– কারণ নাই কোনো। আবার অনেক কারণ। এ লট অব প্রব্লেম। তবে আর চালাতে পারছি না। পেটে পাথর বাঁধা। গান্ধীজী বলেছেন– 'মরণরে, তুহুঁ মম শ্যাম সমান'।
– গান্ধীজী নয়, রবীন্দ্রনাথ।
– চালানোর দরকার কী? মার্বেলের মতো ছেড়ে দিন না, জীবন জীবনের মতো চলুক। গড়াতে গড়াতে গিয়ে যদি কোথাও আটকে যায় তো থেমে যাবে। আপনার অযথা থামিয়ে দিয়ে লাভ কী? জীবনটাকে যারা বেশি ভালোবাসে তারাই সুইসাইড করতে চায়।

– এই সমস্ত মিষ্টি কথায় কাজ হবে না। মিষ্টি কথায় সুইসাইড ভেজে না। সুইসাইড আমি করবোই। ঠেকানোর কোনো কায়দা নাই। আমারে ভুলানোর চেষ্টা করছেন?
পাশ থেকে কিংশুক বলে উঠল– মৃত্যু কনফার্ম?
– থাউজ্যান্ট পার্সেন্ট।
– কীভাবে মরতে চাও, কোন্ পদ্ধতিতে?
– তা এখনও ঠিক করি নাই। সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে পারি নাই।
– আমার কাছে রিভলবার আছে। চলে এসো এক সন্ধ্যায়। কপালে ঠেকিয়ে ট্রিগার টিপে দেব। টেরও পাবে না। কাম ফতে। নির্ভেজাল মৃত্যু। ঠাণ্ডা সুতানালী সাপের মতো মৃত্যু ঢুকে যাবে মগজের মধ্যে। পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে ঢুকে যাবে ফুসফুসের ভেতর, হৃৎপিণ্ডের ভেতর। সমস্ত অক্সিজেন চেটে খাবে। শান্তি। কষ্ট কম। আরামের মৃত্যু।
– গপ্পো মারেন? আপনার কাছে রিভলবার এল কোত্থেকে?
– আছে। লাইসেন্স করা রিভলবার। থ্রি নট থ্রি। পরদিন পত্রিকার হেডলাইন– 'জাকির মরিয়াও অমর'। জীবনের চেয়ে লাশের দাম বেশি এখানে। রাজনৈতিক দলগুলো যার যার দলের নেতা বানিয়ে ছাড়বে। তারপর লাশ নিয়ে কাড়াকাড়ি। এরপর মিছিল, মিটিং, সভা, শ্লোগান, পোস্টার, স্যুভেনির কত কিছু। দেয়ালে দেয়ালে তোমার ছবি। মানব-বন্ধন। চলে এসো।
– না। এইসব হবে না। আপনার কাছে যাই, তারপর দ্যান একটা ক্যাচাল লাগায়ে? বুঝি না আপনার ফন্দি? এ সব চালাকিতে কাজ হবে না। সুইসাইড আমি করবোই। ঠেকাতে পারবেন না। আলটিমেটাম।
– সুইসাইড নিয়ে আপনার পরিকল্পনাটা একটু বলুন তো দেখি?
– হ্যাঁ, বলি, আর কায়দাটা আপনি আগেই নিজে অ্যাপ্লাই করে ফেলেন, চালাকি বুঝি না? কপিরাইট আমার।
– আচ্ছা, ঠিক আছে; সুইসাইড করার আগে আমাকে একটা ফোন দিয়েন। আপনার সে মুহূর্তের অনুভূতিটা জানব।
– সবাইকেই দেব। বিদায় নিতে হবে না সবার কাছ থেকে? তিনশো টাকার কার্ড কিনেছি তিনটা। 'গুড বাই' বলে 'পৃথিবী আমারে চায়, রেখো না বেঁধে আমায়' গাইতে গাইতে লোকটা চলে গেল ঝরাপাতা বিছানো পথে। আমার দিকে তাকিয়ে কিংশুক হাসল। হাসিটায় কোনো একটা রহস্যের গন্ধ পেলাম। বললাম– বিষয়টা কী, বল তো?
– বড় ভাই কলেজে পড়ায়, চরখালি কলেজের বাংলার অধ্যাপক। শহিদুল ইসলাম। মাটির মানুষ। ভাইবোনদের নিজের সন্তানের মতো বড় করেছে, লেখাপড়া শিখিয়ে মানুষ করেছে। কথা নেই বার্তা নেই হঠাৎ একদিন জাকির বিয়ে করে বউ নিয়ে বাড়িতে এসে হাজির। কলেজ থেকে ফিরে শহিদুলের বাক্ রহিত। কী করা? সামাজিক কাজ যেটুকু সম্ভব পালন করে বউ ঘরে তুলল। পরের দিন কিছু লোকজন, আত্মীয়-স্বজনকে দাওয়াত দিল আনুষ্ঠানিকভাবে বরণ করে নেয়ার জন্য। কিন্তু জাকিরকে আর পাওয়া গেল না। জাকির হাওয়া। বিয়ের পরের দিন বাউণ্ডুলে জাকির ফুটে গেছে। তাকে যখন আর পাওয়াই গেল না, তখন মেয়ের বাপ-মা তো আর বসে বসে আঙুল চুষবে না? মাস দুয়েক অপেক্ষা করে মেয়েকে বাড়ি নিয়ে গেল আর ভাইয়ের বিরুদ্ধে একটা কেস ঠুকে দিয়ে গেল। অবশেষে এক লক্ষ টাকা মেয়েকে দিয়ে তবে মুক্তি।
বছরখানেক বাদে কার্তিক এসে হাজির। বউ নেই। বউ তার বেহাত। উল্টো হম্বিতম্বি। তার বউ, সে বুঝবে, অন্যের কী? যার বিয়ে তার খবর নাই, পাড়া-পড়শির ঘুম নাই। ভাইকে শাসাল– আমার বউকে তুমি খেদিয়ে দেছো। তোমার একদিন কি আমার একদিন। শহিদুলের তো বিনা মেঘে বজ্রপাত। যার জন্যে করি চুরি সে-ই বলে চোর। হম্বিতম্বি করে, কিন্তু বউয়ের বাড়ি যাবার সাহস পায় না। আপন মনে গজগজ করে। পানের বরজ আছে একটা। ভাই কলেজে গেলে গোপনে পান তুলে প্রতিদিন বাজারে বিক্রি করে পকেট ভারি করে। এখন তার কাজ খোদার ষাঁড়ের মতো ঘুরে বেড়ানো আর ভাইয়ের নামে কুৎসা রটানো। কিছুদিন পর আবার হাওয়া। কয়েক বছর নিখোঁজ। ছোট বোনের বিয়ের সময় তন্ন তন্ন করে খুঁজল শহিদুল, পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দিল। নেংটি ইঁদুরের খবর নেই। যখন পাত্তা হলো, তখন সে-ই আবার শাসায়– আমাকে না জানিয়ে বোনের বিয়ে দেয়, নিমকহারাম।

বউ তার বিয়েয় বসে নি, তবে বিয়ের কিছু বাদ রাখে নি। পাশের বাড়ির সালমান বিয়ে করবে বলে লোভ দেখিয়েছিল। ফাঁদ পেতে শিকারী উধাও। কাকটিও উড়ল, তালটিও পড়ল। এই আপতকালে বুকে গামছা বেঁধে সাহস সঞ্চয় করে শ্বশুরবাড়ি এসে বলরাম হাজির। যদিও এসব তথ্য তার জানা ছিল না কিছুই। মোক্ষম দাওয়াই। 'দে গরুর গা ধুইয়ে দে'। গলায় দে ঝুলিয়ে তাবিজ। এবারে রেজিস্ট্রি। দাবার ঘুঁটিতে শ্বশুর ঘোড়া চেলেছে, আড়াই প্যাঁচ। নিন্দুকে বলে– লাভের মধ্যে লাভ, বাচ্চটা ফাউ।

'কী হইতে কী হইয়া গেল' সম্প্রতি তার বিয়ে করা স্ত্রীর সাথে আবার পরিণয় হলো। এখন এগারো মাসের বাচ্চা ঘরে। ছেলের বয়স এগারো মাস হলো এখনও বাপ বলে ডাকে না। সংবাদপত্রে খেলার ফিচার লিখে যা পায় তাতে সংসার চলে না। সামান্য ফিচার লেখে বলে সাংবাদিক হিসেবে বউ তাকে স্বীকৃতি দিতে চায় না। এগারো মাসের বাচ্চা থাকা সত্ত্বেও মদের আড্ডায় এক বন্ধু সেদিন তাকে নপুংসক বলেছে। এ রকম অনেক কারণে সুইসাইড করা তার অনিবার্য হয়ে পড়েছে। সুইসাইড শিরোধার্য।

আজ তার সুইসাইডের দিন ধার্য করা হয়েছে। আমাকে ফোন করার কথা। এখনও ফোন আসে নি। মনে পড়ল ফোন নম্বরই তো তাকে দেয়া হয় নি। ফোন করবে কী করে? কিন্তু কৌতুহল হলো। কী করা যায় ভাবছি। এ সময় অপরিচিত এক নম্বর থেকে ফোন এল।

– হ্যালো।

– আমি জাকির।

– জীবিত না মৃত?

– এখনও বর্তমান। একটু পরেই পাস্ট টেন্‌স। ব্ল্যাক এ্যন্ড হোয়াইট। স্মৃতি। দশ বাই বারো ইঞ্চি একখানা রঙিন ছবি তুলে বাঁধিয়ে রেখেছি। একটু পরেই ছবিতে গাঁদাফুলের মালা ঝুলবে। নিচে একটা টুলে থাকবে একটা কলম আর একটা মন্তব্য খাতা। শোক বই। আপনার অনুভূতি ব্যক্ত করুন।

– আপনাকে তো ফোন নম্বর দিতেই ভুলে গিয়েছিলাম। পেলেন কোথায়?

– ভুলে গেছিলেন? নাকি ইচ্ছে করেই দেন নি? আপনি যে ইচ্ছে করেই দেন নি, তা বুঝে আগেভাগেই আমি যোগাড় করে নিয়েছি।

– আপনার বুদ্ধির তারিফ করতে হয়?

– আমার স্ত্রীই শুধু তারিফ করল না। তা কেউ তারিফ করুন আর নাই করুন আমার কথাটা বলে ফেলি। আজ রাত বারোটা এক মিনিটে মধুচন্দ্রিমায় আমার তিরোধান।

– শ্রাবণ মাসে মধুচন্দ্রিমা হয় না। শ্রাবণ পূর্ণিমা হয়।

– সে যা-ই হোক, এটাই শেষ দেখা।

– শেষ দেখা না, শেষ কথা?

– যা হোক, বিদায়।

– কোন্ পদ্ধতিতে সুইসাইড করবেন বলে স্থির করেছেন?

– নতুন একটা পদ্ধতি উদ্ভাবন করেছি। একান্ত নিজস্ব উদ্ভাবন। এখন সেটা ফাঁস করা যাবে না। কাল পত্রিকায় দেখবেন। সচিত্র দিনরাত পত্রিকায়। এবার কিন্তু খেলার ফিচার লিখি নি। এ্যাডভান্স সুইসাইডের ফিচার লিখে রেখে গেছি। দুঃখ একটাই, ফিচারের সাথে মৃত্যুর পরের ছবিটা তুলে রেখে যেতে পারলাম না। এবার সাংবাদিক হিসেবে স্বীকৃতি না দিয়ে যাবে কই? গুড নাইট। বাই।

– বাই। ভালো থাকবেন।

– আলহামদুলিল্লাহ্‌।

রাত বারোটা দুই মিনিটে খুব জানতে ইচ্ছে হলো জাকিরের কী হলো। কল করলাম তার মোবাইলে। রিং টোন বাজছে– একবার বিদায় দে মা ঘুরে আসি।